তাওহীদের ডাক

৫৫ তম সংখ্যা, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০২২
Web : www.tawheederdak.com

- সালাফদের অনুসরণ প্রয়োজন কেন?
- আদর্শবান স্বামীর প্রতি উপদেশ
- সাক্ষাৎকার : মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম
- শতাব্দীর সূর্য মাওলানা আকরম খাঁ
- সমকালীন মনীষী : মুহাম্মাদ মুখতার আশ-শানক্বীতী

শিক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু পাঠ্য বই

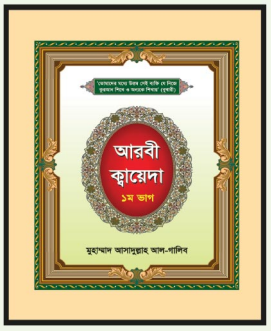

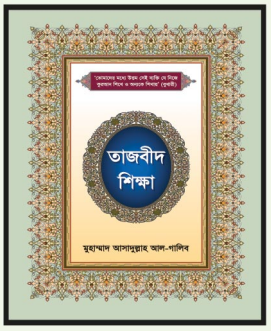

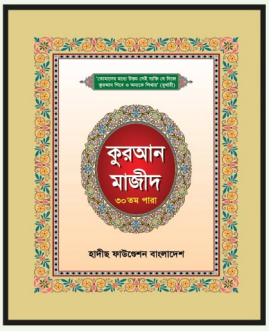

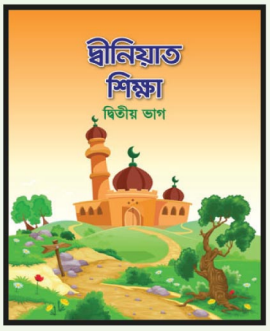

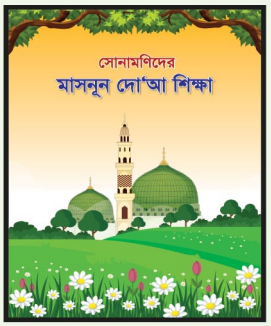

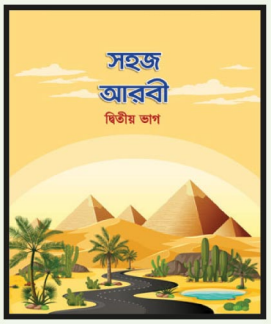

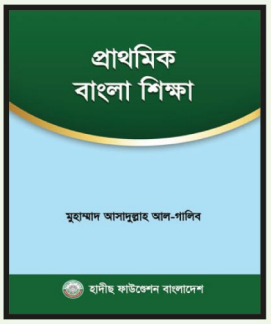

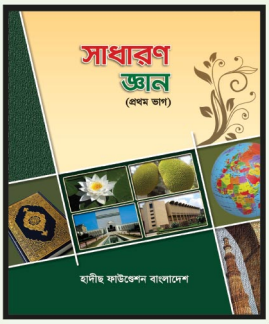

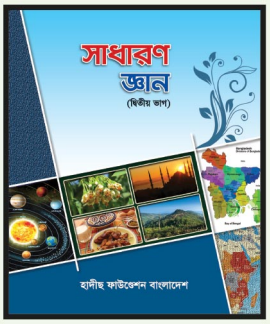

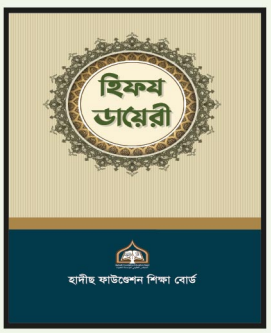

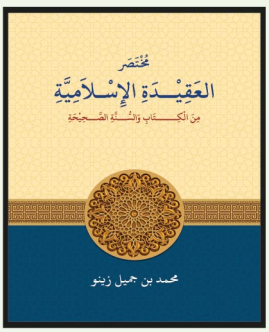

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী, মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০; ঢাকা অফিস : ২২০ বংশাল, মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১

তাওহীদের ডাক
The Call to Tawheed

৫৫ তম সংখ্যা
জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০২২

উপদেষ্টা সম্পাদক
ড. নূরুল ইসলাম

সম্পাদক
ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

নির্বাহী সম্পাদক
ড. মুখতারুল ইসলাম

সহকারী সম্পাদক
আসাদুল্লাহ আল-গালিব

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা,
রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২, ০১৭১৫-২০৯৬৭৬
সার্কুলেশন বিভাগ
০১৭৭৪-৫৮৫৭৯৪
ই-মেইল
tawheederdak@gmail.com
ওয়েবসাইট
www.tawheederdak.com

মূল্য : ২৫ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ,
কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ,
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩
থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ২
- **কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা : আতিথেয়তা** ৩
  আক্বীদা
- **সালাফদের অনুসরণ প্রয়োজন কেন?** ৬
  আব্দুর রহীম
  তাবলীগ
- **কোন কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট অধিক প্রিয়তর** ৯
  তারবিয়াত
- **পারিবারিক বন্ধন** (শেষ কিস্তি) ১২
  ড. মুখতারুল ইসলাম
  তাজদীদে মিল্লাত
- **আদর্শবান স্বামীর প্রতি উপদেশ** ১৮
  মফীযুল ইসলাম
  প্রবন্ধ
- **ইসলামের প্রথম সমাচার** (শেষ কিস্তি) ২১
  আসাদ বিন আব্দুল আযীয
- **সাক্ষাৎকার : মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (খুলনা)** ২৬
  মনীষীদের বক্তব্য থেকে
- **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রদত্ত ভাষণ** ৩৩
  শিক্ষাঙ্গন
- **দ্বীনী জ্ঞানের মর্যাদা** ৩৭
  লিলবর আল-বারাদী
  স্মরণীয় আহলেহাদীছ ব্যক্তিত্ব
- **শতাব্দীর সূর্য মাওলানা আকরম খাঁ** ৪২
  মুহাম্মাদ আবু হুরায়রা ছিফাত
  ভ্রমণস্মৃতি
- **মেঘ-ঝর্ণার বিস্তীর্ণ প্যানারামায় দু'দিন** ৪৮
  আব্দুল্লাহ আল-মুছাদ্দিক
  সমকালীন মনীষী
- **মুহাম্মাদ মুখতার আশ-শানক্বীতী** ৫১
  ফরীদুল ইসলাম
- **পরশ পাথর**
  হিজাব যেভাবে ইসলামের পথ দেখাল ৫২
- **জীবনের বাঁকে বাঁকে** ৫৩
- **সংগঠন সংবাদ** ৫৪
- **সাধারণ জ্ঞান** ৫৬

সম্পাদকীয়

হতাশা থেকে মুক্তি

মানুষের ব্যক্তিগত অপারগতা ও অজ্ঞতা; অপরদিকে সামাজিক অবিচার ও অনাচার- মূলতঃ এদু'টি মৌলিক কারণ একদিকে যেমন তাকে জীবনযুদ্ধে অসহায় ও বিপন্ন করে তোলে, অন্যদিকে সমাজের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ ও বিদ্রোহী করে তোলে। আর এখান থেকেই ধীরে ধীরে পুঞ্জিভূত হয় হতাশা আর বেদনার এক অবিচ্ছেদ্য মেঘকাব্য। যা কখনও একাকীত্বের বেদনায় মুষড়ে পড়ে গুমরে গুমরে কাঁদে আবার কখনওবা ক্ষোভের বিজলী বর্ষণে অবিরল ধারায় ঝরে পড়ে। মানুষের এই জীবনগতি প্রায় সবারই একই রকম হলেও পার্থক্য ঘটে বোধের জায়গায় এবং নীতির প্রতি অবিচলতায়। যারা ঈমানদার তারা ধৈর্য ও আত্মবিশ্বাসকে নিত্য সাথী করে সাধ্যমত আদর্শের পথে নিজেকে পরিচালনা করেন, কিন্তু যারা ঈমানহীন তারা প্রায়শই এই যুদ্ধের ময়দানে নিঃশর্ত আত্মসমার্পণ করে স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন। আর এভাবেই চলে আসছে শত-সহস্র বছরের মানবীয় জীবনাচার।

বাংলাদেশ সহ বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বস্তুগত উন্নয়নের জোয়ার ক্রমবর্ধমান হলেও মানুষের ব্যক্তিগত জীবনাচারে হতাশার বিস্তার কিন্তু ধীরে ধীরে বাড়ছে। কারণ মিডিয়া ও মার্কেটিং-এর সীমাহীন হাইপে মানুষের ব্যক্তিগত প্রত্যাশার জায়গা যেই উত্তুঙ্গ হারে বাড়ছে, প্রাপ্তির জায়গা নিঃসন্দেহে সেই হারে বাড়ছে না। ফলে মানুষ দ্রুতই নিজেকে প্রতিযোগিতার ময়দানে পরাজিত এবং পশ্চাদপদ ভেবে হতোদ্যম হয়ে পড়ছে। হতাশার গ্রাস থেকে তারা সহজে নিজেকে বের করে আনতে পারছে না। ফলে অধিকাংশ সময় নেতিবাচক সিদ্ধান্তেই সে মুক্তি খুঁজে নিতে চাচ্ছে। কেউ ক্ষণিকের মিথ্যা সুখের জন্য বেছে নিচ্ছে অনৈতিক সিদ্ধান্ত কিংবা মাদকের মত নীল দংশন, কেউবা চূড়ান্ত পর্যায়ে বেছে নিচ্ছে আত্মহননের পথ।

এখন প্রশ্ন হ'ল, অধিকাংশ মানুষ কেন নেতিবাচক সিদ্ধান্তকেই অগ্রাধিকার দেয়? কেন শত প্রাপ্তির মাঝেও অপ্রাপ্তিগুলোকেই বড় করে দেখে? কেন এত হতাশায় মুহ্যমান হয়ে পড়ে নিজেকে নিঃশেষ করে দেয়ার পরিকল্পনা করে? এর উত্তর খুঁজতে গেলে আমরা কয়েকটি বিষয়কে সামনে আনতে পারি- **(১) আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের দুর্বলতা :** যে ব্যক্তি তার সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তার আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে না, আস্থা রাখে না; সে কখনই জীবনে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, সঠিক পথে পরিচালিত হতে পারে না। কেননা সে তার জীবনের মূল ভরকেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। **(২) জীবনের মূল্য সম্পর্কে অজ্ঞতা :** মানুষকে আল্লাহ খুব সংক্ষিপ্ত একটি সময় দিয়েছেন তাকে পরীক্ষা করার জন্য। একজন পরীক্ষার্থী যেমন তার পরীক্ষার মূল্য বুঝে বলে পরীক্ষার হলে ভালো ফলাফলের জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম করে, তেমনি এই জীবন পরীক্ষাগারের মূল্য সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তি প্রতিটি মুহূর্তকে গুরুত্বপূর্ণ ভেবে পরকালীন সাফল্যের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। কিন্তু যে অজ্ঞ ব্যক্তি সে শিশু, পাগল কিংবা চতুষ্পদ জন্তুর মতই উদাসীন থেকে যায়। ফলে এই জীবনের প্রকৃত মূল্য সে অনুধাবন করতে পারে না। তাই এর বিনাশ সাধনেও সে দ্বিধাবোধ করে না। **(৩) জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে অসচেতনতা :** আল্লাহর দাসত্বকে যে জীবনের মূল লক্ষ্য বানাতে পারে নি, সে নিঃসন্দেহে লক্ষ্যহীন কিংবা ভুল লক্ষ্যপানে ছুটে চলা ব্যক্তি। সুতরাং জীবনের কোন অংক না মেলাতে পারলে খুব সহজেই সে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। **(৪) ধৈর্যের অভাব :** পার্থিব জীবনে আমাদের উপর যে কোন পরীক্ষা নেমে আসবে। কখনও সে পরীক্ষা কঠিন থেকে কঠিনতর হবে, কিন্তু হাল ছেড়ে দেয়া মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়। সর্বাবস্থায় সে আল্লাহর উপর ভরসা রাখবে এবং ধৈর্য সহকারে সুসময়ের জন্য অপেক্ষা করবে, এটাই ঈমানের দাবী। যারা এই ধৈর্যের নীতি অবলম্বন করে না, তারা অতি সহজেই হতাশাগ্রস্ত হয়ে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। **(৫) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ:** আধুনিক সমাজে প্রত্যেক মানুষ পৃথক এন্টিটি হিসাবে বসবাস করতে চায়। যে যার মত চলাফেরা করবে, কেউ কারো ব্যাপারে নাক গলাবে না- এটাই মূলনীতি। ফলে একে অপরের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়া এখানে যরূরী নয়। স্বার্থপরতা, অসামাজিকতা, আত্মকেন্দ্রিকতা এই সমাজব্যবস্থার আবশ্যিক অনুষঙ্গ। একে অপরের অতি কাছে থেকেও তারা একেকজন বসবাস করে অবরুদ্ধ জানালা নিয়ে। ফলে ফিতরাতবিরোধী এই সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ সহজেই হতাশা ও বিষণ্নতাগ্রস্ত হচ্ছে।

এ অবস্থা থেকে উদ্ধার পেতে চাইলে আমাদের জন্য করণীয় হ'ল- **প্রথমতঃ ইতিবাচক জীবন যাপন করা :** মনে রাখতে হবে, মানুষের জীবন ভালো-মন্দ, সহজ-কঠিন, ইতি আর নেতির বিচিত্র সমাহার। জীবনে কখনো ভালো সময় আসবে, কখনও মন্দ সময় আসবে এটাই জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ। অতএব একজন মুমিন ব্যক্তি সর্বদা মধ্যমপন্থায় তার জীবন পরিচালনা করবে। এমনভাবে যে, আনন্দের সময় সে আত্মহারা হবে না, আবার দুঃখের সময় শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়বে না। জীবনের সকল অবস্থায় শোকর ও ছবরের মাধ্যমে ভারসাম্য বজায় রাখবে। সবকিছুকে সাধ্যমত ইতিবাচকভাবে নেবে। যেমন ওহুদ যুদ্ধের পরাজয়ে যেন মুসলমানরা অধিক শোকাকুল না হয়, সেজন্য ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি লালনের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের স্বান্তনাসূচক বক্তব্য, তোমাদেরকে যদি আঘাত লেগে থাকে, অনুরূপ আঘাত (বদর যুদ্ধে) তো তাদেরও লেগেছে এবং মানুষের মধ্যে এ (বিপদের) দিনগুলিকে পর্যায়ক্রমে অদল-বদল করে থাকি *(আলে ঈমরান ১৪০)*। **দ্বিতীয়তঃ হতাশাকে প্রশ্রয় না দেয়া :** জীবনের সুখ-দুঃখের সাথে হতাশার যোগ খুবই ওতপ্রোত। যে কোন অপ্রত্যাশিত কথায় ও কাজে কিংবা অপ্রাপ্তির বেদনায় আমাদের মধ্যে হতাশা আসতেই পারে। কিন্তু একজন বিশ্বাসী মানুষ তা নিজের মধ্যে জিইয়ে রাখতে পারে না। তার চেষ্টা থাকে যে কোন মূল্যে তা দূরীভূত করা কিংবা ভুলে যাওয়া। কেননা আল্লাহর বাণী হ'ল- 'আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া পথভ্রষ্ট লোকদের কাজ' *(হিজর ৫৬)*। **তৃতীয়তঃ মানুষের সাথে সুসম্পর্ক রাখা :** মানুষের সাথে মিশতে পারা এবং তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখতে পারা হতাশা ও বিষণ্নতা থেকে বেরিয়ে আসার অন্যতম কার্যকর মহৌষধ। এজন্য রাসূল (ছাঃ) আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখাকে অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছেন। আত্মকেন্দ্রিক ও অসামাজিক মানুষ বরাবরই নিজের কষ্টের সময়গুলো মানুষের সাথে ভাগাভাগি করতে না পেরে নিদারুণ মানসিক কষ্টে আপতিত হয়। সুতরাং সমাজের ভালো মানুষদের সংস্পর্শে থাকা, সংঘবদ্ধ ও সাংগঠনিক জীবন যাপন করা সুস্থ মানুষের জন্য খুবই যরূরী এবং ইসলামের অন্যতম নির্দেশনা। **চতুর্থতঃ শয়তানী কুমন্ত্রণার ব্যাপারে সতর্ক থাকা :** শয়তান মানুষের চূড়ান্ত শত্রু। সে সর্বদা কুমন্ত্রণা যোগায় মানুষকে অন্যায় পথে নেয়ার জন্য। আল্লাহ বলেন, 'শয়তান তোমাদের দারিদ্রের ভয়

[বাকী অংশ ৫০ পৃষ্ঠা দ্রঃ]

আতিথেয়তা

আল-কুরআনুল কারীম :

1- هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ- إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ- فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ- فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ-

(১) 'তোমার নিকটে ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের খবর এসেছে কি? যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, সালাম (আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হৌক!) জবাবে সেও বলল, সালাম। (মনে মনে বলল,) এরা তো অপরিচিত লোক। অতঃপর সে তার স্ত্রীর নিকট গেল এবং (তাদের আপ্যায়নের জন্য) একটা ভূনা বাছুর নিয়ে এল। অতঃপর সেটি তাদের সামনে রাখল। সে বলল, আপনারা কি খাবেন না?' *(যারিয়াত ৫১/২৪-২৭)*।

2- وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَاقَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ -

(২) 'তার কওমের লোকেরা তার দিকে দৌড়ে এল, যারা পূর্ব থেকে কুকর্মে অভ্যস্ত ছিল। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমার ঐসব মেয়েরা রয়েছে (যারা তোমাদের স্ত্রী), তারাই তোমাদের জন্য পবিত্র। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর আমাকে আমার মেহমানদের সামনে লজ্জিত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কোন ভাল লোক নেই?' *(হূদ ১১/৭৮)*।

3- وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ-

(৩) 'আর যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে এ নগরীতে বসবাস করত এবং ঈমান এনেছিল। যারা মুহাজিরদের ভালবাসে এবং তাদেরকে (ফাই থেকে) যা দেওয়া হয়েছে, তাতে তারা নিজেদের মনে কোনরূপ আকাংখা পোষণ করে না। আর তারা নিজেদের উপর তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়, যদিও তাদেরই রয়েছে অভাব। বস্তুতঃ যারা নিজেদেরকে হৃদয়ের কার্পণ্য হ'তে বাঁচাতে পেরেছে, তারাই হ'ল সফলকাম' *(হাশর ৫৯/৯)*।

4- يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ-

(৪) 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া না হলে তোমরা খাওয়ার জন্য আহার্য প্রস্তুতির অপেক্ষা না করে নবীগৃহে প্রবেশ করো না। তবে যখন তোমাদের ডাকা হবে, তখন প্রবেশ করো। অতঃপর খাওয়া শেষে বেরিয়ে পড়ো। অহেতুক গল্প-গুজবে রত হয়ো না' *(আহযাব ৩৩/৫৩)*।

হাদীছে নববী :

(৫) আর আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে এসে বলল, আমি খুব ক্ষুধার্ত। তখন তিনি তাঁর সহধর্মিণীদের নিকট পাঠালেন; কিন্তু তিনি তাদের কাছে কিছুই পেলেন না। এরপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, এমন কেউ আছে কি, যে আজ রাতে এ লোকটিকে মেহমানদারী করতে পারে? আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত করবেন। তখন আনছারদের এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, আমি আছি, হে আল্লাহ্র রাসূল! এরপর তিনি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িতে গেলেন এবং নিজ স্ত্রীকে বললেন, ইনি রাসূল (ছাঃ)-এর মেহমান। কোন জিনিস জমা করে রাখবে না। মহিলা বলল, আল্লাহ্র কসম! আমার কাছে ছেলে-মেয়েদের খাবার ছাড়া আর কিছুই নেই। তিনি বললেন, ছেলেমেয়েরা রাতের খাবার চাইলে তুমি তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দিও, (খাবার নিয়ে) আমার কাছে আসিও, অতঃপর বাতিটি নিভিয়ে দিও। আজ রাতে আমরা না খেয়ে থাকব। সুতরাং মহিলা তা-ই করল। পরদিন সকালে আনছারী ছাহাবী রাসূল (ছাঃ)-এর খেদমতে আসলেন। তিনি বললেন, অমুক ব্যক্তি ও তার স্ত্রীর প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন অথবা অমুক অমুকের কাজে আল্লাহ হেসেছেন। এরপর আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন, 'এবং তারা তাদের নিজেদের উপর অন্যদের প্রাধান্য দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও'।[১]

6- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ-

(৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মেহমানদারি করতে হবে তিন দিন। তার অধিক করা হলে তা দান হিসাবে গণ্য হবে'।[২]

7- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَاءَ إِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَجَاءَ بِخُبْزٍ وَزَيْتٍ فَأَكَلَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ.

---

১. *বুখারী হা/৪৮৮৯।*
২. *মুসনাদে আহমাদ হা/৮০৯৩।*

(৭) আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত একদা নবী করীম (ছাঃ) সা'দ ইবনু উবাদাহ (রাঃ)-এর বাড়িতে গেলেন। সা'দ (রাঃ) রুটি ও যাইতুন তৈল আনলেন। তা খাওয়ার পর নবী (ছাঃ) বললেন, তোমাদের নিকট ছায়েমগণ ইফতার করেছে, সৎ লোকেরা তোমাদের খাদ্য খেয়েছে এবং ফিরিশতাগণ তোমার জন্য রহমতের দো'আ করেছেন'।[৩]

8- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا وَوَطْبَةً، فَأَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ أُتِيَ بِتَمْرٍ فَكَانَ يَأْكُلُهُ وَيُلْقِي النَّوَى بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ وَيَجْمَعُ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى، وَفِي رِوَايَةٍ فَجَعَلَ يُلْقِي النَّوَى عَلَى ظَهْرِ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، ثُمَّ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ، فَقَالَ أَبِي وَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ: ادْعُ اللَّهَ لَنَا فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ. وقال صلى الله عليه وسلم: اللَّهُمَّ! أَطْعِمْ مِنْ أَطْعَمَنِي، وَاسْقِ مَنْ سَقَانِي-

(৮) আবদুল্লাহ ইবনু বুসর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, 'একদিন রাসূলু (ছাঃ) আমার পিতার কাছে আসলেন। আমরা তাঁর সামনে কিছু খাদ্য ও হায়স (খেজুর, পনির ও ঘি মিশ্রিত এক জাতীয় মিষ্টান্ন) দিলাম। এর থেকে তিনি কিছু খেলেন, তারপর তাঁর কাছে আরও কিছু খেজুর আনা হলো। তিনি তা খেতে লাগলেন। তর্জনী ও মধ্যমা আঙুল দিয়ে তিনি খেজুরের মধ্যখান দিয়ে বিচি বের করতে লাগলেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে, তর্জনী ও মধ্যমা আঙুলের পিঠের দিক দিয়ে বিচি ফেলতে থাকলেন। অতঃপর তাঁর কাছে কিছু পানীয় আনা হলে তিনি তা পান করলেন। আমার পিতা তাঁর আরোহীর লাগাম ধরে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে দো'আ করুন। তিনি তখন দো'আ করলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে যা দান করেছো তাতে বারাকাত দাও এবং তাদেরকে ক্ষমা করো ও তাদের ওপর অনুগ্রহ কর' রাসূল (ছাঃ) অন্যত্র বলেছেন, 'হে আল্লাহ! যে আমাকে খাইয়েছে এবং পানাহার করিয়েছে, তাকেও তুমি খাও এবং পান করাও'।[৪]

9- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لَا يُقْرُونَنَا، فَمَا تَرَى؟ فَقَالَ لَنَا:إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا؟ فَانْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ-

(৯) উকবাহ্ ইবনু 'আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি আমাদেরকে কোথাও পাঠালে আমরা যদি এমন এক জনপদে গিয়ে পৌঁছি, যারা আমাদের মেহমানদারী করছে না। এমতাবস্থায় আপনার অভিমত কী? তখন তিনি আমাদেরকে বললেন, যদি তোমরা কোন জনপদে অবতরণ করো, আর যদি তারা তা না করে, তবে তাদের নিকট হতে তাদের কর্তব্য পরিমাণ মেহমানের হক আদায় করে নেবে'।[৫]

10- عَنْ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ فَهُوَ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِنْ شَاءَ اقْتَضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ-

(১০) আবু কারীম (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, এক রাত মেহমানদারী করা মুসলিমের কর্তব্য। যার আঙ্গিনায় মেহমান নামে, একদিন মেহমানদারী করা তার উপর ঋণ পরিশোধের সমান। সে ইচ্ছা করলে তার এ ঋণ পরিশোধ করবে বা তা ত্যাগ করবে'।[৬]

মনীষীদের বক্তব্য :

১. ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল বলেন, 'প্রত্যেক মুসলমানের উপর মেহমানদারী করা আবশ্যক, যদি মেহমান কাফেরও হয়'।[৭]

২. আবু লাইছ সামরকান্দী বলেন, কোন মেহমান তার মেযবানের ব্যাপারে চারটি জিনিস খেয়াল রাখবেন- ক. মেযবান যেখানে বসাবেন, তিনি সেখানে বসবেন খ. মেহমানদারী যা দিয়েই করাবেন, তাতেই সন্তুষ্ট থাকবেন গ. অনুমিত না নিয়ে খানা থেকে উঠে পড়বেন না ঘ. অবশেষে মেযবানের জন্য বিশেষভাবে দো'আ করবেন'।[৮]

৪. ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, মেহমানের আদব হল, মেহমান কখনো খাবারের ব্যাপারে মেযবানের নিকট বিশেষভাবে কোন চেয়ে বসবে না। বরং যে খানাটি সহজ, তা দিয়ে শুরু করা এবং মেযবানের কাজগুলোকে সহজভাবে নেয়া'।[৯]

৫. ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, মেহমানদারীর অন্যতম আদব হল মেহমানকে বিদায় জানাতে তাকে বাড়ির বাহির পর্যন্ত এগিয়ে দেওয়া'।[১০]

সারবস্তু :

১. মেহমানদারি একটি মহৎ গুণ, যা আত্মীয়তার বন্ধনকে মযবুত করে, বন্ধুত্বকে করে সুদৃঢ় এবং সামাজিক সৌহার্দ্য সৃষ্টিতে বড় ধরণের ভূমিকা রাখে।

২. নবী-রাসূলসহ সকল যুগের সত্যসেবীগণ মেহমান-অতিথিপরায়ণ ছিলেন।

৩. প্রত্যেক মুসলমানের উচিত যথাসাধ্য মেহমানের মেহমানদারী করা।

৫. আনছার-মুহাজিরদের মেহমানদারীর নযীর পৃথিবীর ইতিহাসে মেলা ভার। আর তাঁরাই এ ব্যাপারে আমাদের পূর্বসূরী।

---

৩. আহমাদ, বায়হাক্বী, ইবনু মাজাহ, আবুদাউদ হা/৩৮৫৪।
৪. মুসলিম হা/২০৪২ ও ২০৫৫।
৫. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪২৪৫।
৬. আহমাদ, আদাবুল মুফরাদ, ইবনু মাজাহ, আবুদাউদ হা/৩৭৫০।
৭. মুগনী ১১/৯১ পৃ.।
৮. ফাতাওয়ায়ে হিন্দী, লাজনায়ে উলামা বেরিয়াসাতে নিযামুদ্দীন বালখী ৫/৩৪৪ পৃ.।
৯. আদাবুশ শারঈয়্যাহ লি ইবনু মুফলেহ ৩/২০৮ পৃ.।
১০. ফাৎহুল বারী ৯/৫২৮ পৃ.।

সালাফদের অনুসরণ প্রয়োজন কেন?

-আব্দুর রহীম

ভূমিকা : ইসলাম এমন একটি নির্ভেজাল ধর্ম, যা রাসূল (ছাঃ) থেকে বিশুদ্ধভাবে ছাহাবায়ে কেরাম অতঃপর তাবেঈ ও তাবে‘ তাবেঈগণ থেকে সালাফদের মাধ্যমে আমাদের নিকট পৌঁছেছে। সেজন্য ইসলামের সঠিক বার্তা পেতে সালাফদের অনুকরণ ও অনুসরণ একান্ত প্রয়োজন। সালাফী পরিভাষাটি অতি প্রাচীন ও পুরানো। তারা ছিলেন উত্তম সময়ে আবির্ভূত সৃষ্টির সেরা মানুষ যাদের উত্তমতার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক সত্যায়িত, প্রমাণিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। কেননা তারা দেখেছেন ওহি নাযিলের স্থান, সময় ও প্রেক্ষাপট। তারা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে থেকে হাদীছ শুনেছেন, বুঝেছেন, ব্যাখ্যা করে নিয়েছেন। হাদীছ কোন প্রেক্ষাপটে বলা হয়েছে সেটাও তারা অবলোকন করেছেন। কারো কোন হাদীছ জানা না থাকলে অপর ছাহাবীকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়েছেন। আর ছাহাবীগণ থেকে তাবেঈগণ দিক্ষা লাভ করে তারাও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দিয়েছেন। বর্তমান সময়ে কুরআন ও হাদীছের সঠিক ব্যাখ্যা জানতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে সালাফদের নিকটে। সেজন্য আমাদের জীবন পরিচালিত হতে হবে সালাফদের বুঝ অনুযায়ী ইসলামকে অনুকরণ ও অনুসরণের নীতির উপর ভিত্তি করে। যদি তাদের বুঝ অনুযায়ী আমরা কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যা না বুঝে শাব্দিক অর্থ বা অনুবাদের উপর ভিত্তি করে বোঝার চেষ্টা করি তাহলে পথভ্রষ্ট হতে হবে। শয়তানী চরমপন্থার চোরাগলিতে পড়ে ঈমান ও আমল দু’টিই হারাতে হবে এবং নিক্ষিপ্ত হতে হবে জাহান্নামের অতল গহ্বরে। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে সালাফদের অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে দালীলিক আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

সালাফদের অনুসরণের গুরুত্ব :

ছাহাবায়ে কেরাম ও তাদের অনুসারী পূর্ববর্তী বিদ্বানগণ সর্বদা হকের উপর অটল ছিলেন। তাঁরা বহু ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে আমাদেরকে নির্ভেজাল ইসলাম উপহার দিয়েছেন। সেজন্য সর্বাধিক মর্যাদা লাভের অধিকারী তারাই। আল্লাহ তা‘আলা তাদের প্রশংসা করে কুরআন মাজীদে বলেন, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ‘মুহাজির ও আনছারগণের মধ্যে যারা অগ্রবর্তী ও প্রথম দিককার এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে নিষ্ঠার সাথে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এটাই হ’ল মহা সফলতা’ *(তওবা ৯/১০০)*।

অত্র আয়াতে মুহাজির ও আনছার ছাহাবীগণের এবং তাদের অনুসারী তাবেঈগণের উচ্চ মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘শ্রেষ্ঠ যুগ আমার যুগ, অতঃপর তাদের পরবর্তী (তাবেঈ)গণের যুগ, অতঃপর তাদের পরবর্তী (তাবে তাবেঈ) গণের যুগ’। সাথে সাথে ক্বিয়ামত পর্যন্ত যারা তাদের যথার্থ অনুসারী হবে, তাদের প্রশংসা করা হয়েছে। তারাই হলেন উম্মতের নাজী ফের্কা। যারা তাদের খালেছ ঈমান ও বিশুদ্ধ আমলের কারণে শুরুতেই জান্নাতী হবেন। আয়াতে অগ্রবর্তী ও প্রথম দিককার বলতে জ্যেষ্ঠ মুহাজির ও আনছার ছাহাবীগণকে বুঝানো হলেও মর্মার্থে সকল ছাহাবীকে বুঝানো হয়েছে। অতঃপর তাদের যথার্থ অনুসারীদের মধ্যে প্রথম সারির হলেন তাবেঈগণ, অতঃপর তাদের অনুসারী তাবে-তাবেঈগণ, এরপর কিয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুসারী মুসলিমগণ। যারা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করেন এবং ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী শরী‘আত ব্যাখ্যা করেন।

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ‘আর তাদের অন্যান্যদের জন্যেও যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি, বস্তুতঃ আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময় *(জুম‘আ ৬২/০৩)*। তিনি আরো বলেন, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ‘যারা তাদের পরে এসেছে। যারা বলে হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের এবং আমাদের ভাইদের ক্ষমা কর, যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে। আর ঈমানদারগণের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয়ই তুমি স্নেহশীল, পরম দয়ালু’ *(হাশর ৫৯/১০)*। সালাফদের অনুকরণ কারীদের মর্যাদায় আল্লাহ আরো বলেন, وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ ‘আর যারা পরে ঈমান এনেছে ও হিজরত করেছে এবং তোমাদের সাথে থেকে জিহাদ করেছে, তারাও তোমাদের অন্তর্ভুক্ত *(আনফাল ৮/৭৫)*।

সুতরাং সালাফদের অনুসরণের বিকল্প নেই। কেউ যদি সালাফদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে বা তাদের বুঝকে অবজ্ঞা করে নিজের মত করে ধর্মীয় জীবন পরিচালনা করে তাহলে সে পথভ্রষ্ট হবে। রাসূল (ছাঃ) সালাফদের অনুসরণের গুরুত্বারোপ করে বলেন, اسْتَوْصُوا بِأَصْحَابِى خَيْراً ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ

لَيَبْتَدِئُ بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا ‘তোমরা ছাহাবীগণের ব্যাপারে উত্তম উপদেশ গ্রহণ কর। এরপর যারা তাদের সাথে সংযুক্ত (তাবেঈগণ) এরপর যারা তাদের সাথে সংযুক্ত (অর্থাৎ তাবে-তাবেঈগন)। এরপরে মিথ্যাচার এমনভাবে ছড়িয়ে পড়বে যে, তারা সাক্ষ্য চাওয়ার আগেই সাক্ষ্য দিতে যাবে’।[১]

সালাফদের অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা :

প্রথমত : ছাহাবীগণ রাসূল (ছাঃ)-এর পাশে থাকতেন। তারা ছিলেন সুন্নাহ ও তাফসীর সম্পর্কে অধিক ওয়াকিফহাল। ছাহাবায়ে কেরাম তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ করতেন। তাঁরা দ্বীনের বিষয়ে তাঁর জীবনের ছোট বড় সকল বিষয় হেফাযত করেছেন। তারা রাসূল (ছাঃ) থেকে প্রতিটি জিনিস হাতে-কলমে শিক্ষা লাভ করেছেন। এজন্য তারাই হলেন সুন্নাহর জ্ঞানে সর্বাধিক সমৃদ্ধ। অতএব আমাদের সুন্নাহ অনুযায়ী চলতে হলে তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে চলতে হবে।

দ্বিতীয়ত : আল্লাহ তা‘আলা আল কুরআনুল কারীমে বহু জায়গায় ছাহাবী ও তাবেঈগণের সম্মান-মর্যাদা ও আদালত তথা ন্যায়-ইনছাফের সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং তাদের পবিত্রতা বর্ণনা করেছেন। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘মুহাজির ও আনছারগণের মধ্যে যারা অগ্রবর্তী ও প্রথম দিককার এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে নিষ্ঠার সাথে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এটাই হ’ল মহা সফলতা’ *(তওবা ৯/১০০)*।

তৃতীয়ত : রাসূল (ছাঃ) ছাহাবী, তাবেঈ ও পরবর্তী বিদ্বানগণের প্রশংসা ও তাদের উত্তমতার বিষয়ে গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করেছেন। যা তাদের অনুসরণীয় হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট দলীল। রাসূল (ছাঃ) বলেন, خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ،ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِىءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ– ‘সর্বোত্তম মানুষ হচ্ছে আমার যুগের মানুষ। এরপর উত্তম হল এর পরবর্তীতে আগমনকারী লোকেরা। তারপর উত্তম হল যারা তাদের পরবর্তীতে আসবে তারা। অতঃপর এমন এক জাতির আগমন ঘটবে যাদের কারো সাক্ষ্য কসমের আগেই হয়ে যাবে, আবার কসম সাক্ষ্যের আগেই হয়ে যাবে’।[২] অর্থাৎ কসম ও সাক্ষ্যের মধ্যে কোন মিল থাকবে না। কসম ও সাক্ষ্য উভয়টাই মিথ্যা হবে। অন্যত্র তিনি বলেন, خَيْرُ أُمَّتِى قَرْنِى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ . قَالَ عِمْرَانُ فَلاَ أَدْرِى أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذُرُونَ وَلاَ يَفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ- ‘আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে আমার যুগ, তারপর উত্তম হচ্ছে তাদের পরবর্তীতে যারা আসবে তারা। তারপর উত্তম হচ্ছে তাদের পরবর্তীতে যারা আসবে তারা। ইমরান বলেন, রাসূল (ছাঃ) তাঁর পরে দুই যুগের কথা বলেছেন নাকি তিন যুগের কথা বলেছেন তা আমি বলতে পারছিনা। অতঃপর তিনি বলেন, তোমাদের পরে এমন কওম আসবে যারা সাক্ষ্য দিবে, কিন্তু তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। তারা বিশ্বাসঘাতকতা করবে, আমানত রক্ষা করবে না। তারা মানত করবে, কিন্তু তা পূর্ণ করবে না। আর তাদের শরীরে চর্বি দেখা দিবে’।[৩]

আর সালাফদের অনুকরণ করার আবশ্যিকতার পিছনে হিকমত হ’ল ঐ সকল লোকদের দাবীকে প্রত্যাখ্যান করা যারা বলে যে, রাসূল (ছাঃ) এর অনুসরণ বা আনুগত্য করা সম্ভব নয়। কারণ তিনি ছিলেন মা‘ছূম, মানবীয় প্রবৃত্তির উর্ধ্বে এবং আল্লাহ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত। কিন্তু ছাহাবায়ে কেরাম আমাদের মত মানুষ হয়েও তারা দেখিয়ে দিয়েছেন যে, পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ সম্ভব। অথচ তারা আমাদের মতই মানুষ ছিলেন।

ছাহাবীগণ কর্তৃক রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণের দৃষ্টান্ত :

ছাহাবীগণ রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণের ক্ষেত্রে সর্বাধিক অগ্রগামী ছিলেন। রাসূল (ছাঃ) যদি কারো হাত ধরে একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন, সেই হাদীছটি বর্ণনা করার সময় কারো হাত ধরে সেভাবেই ঐ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাদের মধ্যে আবুবকর (রাঃ) ছিলেন অগ্রগামী। যেমন হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ، وَنَفْسَهُ، إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ "، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: فَوَاللهِ، مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ছাঃ)-এর ইন্তিকালের পর আবু বকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) খলীফা হন তখন আরবের কিছু লোক যাকাত প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানায়। (আবু বকর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন শুনে) ওমর (রাঃ) আবু বকর (রাঃ)-কে বললেন, আপনি

১. *আহমাদ হা/১১৪; ইবনু হিব্বান হা/৭২৫৪, সনদ ছহীহ।*
২. *বুখারী হা/২৬৫২; মিশকাত হা/৩৭৬৭।*
৩. *বুখারী হা/৩৬৫০; মিশকাত হা/৬০০১।*

কিভাবে যুদ্ধ করবেন? অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, মানুষ যে পর্যন্ত লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু (অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন ইলাহ নেই- এ কথার) ঘোষণা না দিবে ততক্ষণ তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যে ব্যক্তি লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু বলল, সে নিজের ধন-সম্পদ ও জীবন আমার থেকে নিরাপদ করে নিল। তবে ইসলামের কারণে হলে ভিন্ন কথা। আর এর হিসাব আল্লাহ্র কাছে। তখন আবু বকর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্র কসম যে ব্যক্তি ছালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করবে, আমি অবশ্য অবশ্যই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। কারণ নিঃসন্দেহে যাকাত সম্পদের হক। আল্লাহ্র কসম! তারা (যাকাত অস্বীকারকারীরা) যদি আমাকে একটি ছাগলের বাচ্চাও দিতে অস্বীকার করে যা তারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সময় দিত, তাহলেও আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। (তখন) ওমর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্র শপথ! যুদ্ধের এ সিদ্ধান্ত আল্লাহ্র তরফ থেকে আবু বকর-এর অন্তর্চক্ষু খুলে দেয়া ছাড়া আর কিছু বলে আমি মনে করি না'।[৪]

অত্র হাদীছে আবুবকর (রাঃ)-এর সুন্নাতের অনুসরণের প্রতি কঠোরতা প্রকাশিত হয়েছে। ফলে তিনি সেই সকল মুরতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিলেন, যারা রাসূল (ছাঃ)-এর আমল যাকাত দিয়েছে অথচ এখন দিতে রাযী নয়। এমন কি রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে উটের রশি দিয়ে থাকলে এখনও তা দিতে হবে। অন্যথায় তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ বলবৎ থাকবে'।[৫]

খোলাফায়ে রাশেদীনের দৃষ্টান্ত :

কেবল আবু বকর (রাঃ) নন, বরং সকল খলীফা রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্যের ক্ষেত্রে অগ্রগামী ছিলেন। তারা সার্বিক ক্ষেত্রে রাসূল (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া সুন্নাতকে কোন পরিবর্তন ছাড়াই অনুসরণ করতেন। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ص فِى يَدِهِ ، وَفِى يَدِ أَبِى بَكْرٍ بَعْدَهُ ، وَفِى يَدِ عُمَرَ بَعْدَ أَبِى بَكْرٍ ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ جَلَسَ عَلَى بِئْرِ أَرِيسَ - قَالَ - فَأَخْرَجَ الْخَاتَمَ ، فَجَعَلَ يَعْبَثُ بِهِ فَسَقَطَ قَالَ فَاخْتَلَفْنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مَعَ عُثْمَانَ فَنَنْزَحُ الْبِئْرَ فَلَمْ نَجِدْهُ

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ছাঃ)-এর আংটি (তার জীবদ্দশায়) তার হাতেই ছিল। তার (ইন্তে কালের) পরে তা আবু বকর (রাঃ)-এর হাতে থাকে। আবু বকর (রাঃ)-এর (মৃত্যুর) পরে তা ওমর (রাঃ)-এর হাতে থাকে। যখন উছমান (রাঃ)-এর আমল এল, তখন (একদিন) তিনি ঐ আংটি হাতে নিয়ে আরীস নামক কুপের উপর বসেন। আংটিটি বের করে নাড়চাড়া করছিলেন। হঠাৎ তা (কুপের মধ্যে) পড়ে যায়। আনাস (রাঃ) বলেন, আমরা তিন দিন যাবত উছমানের (রাঃ)-সাথে অনুসন্ধান চালালাম। কূপের পানি ফেলে দেয়া হ'ল কিন্তু আংটি আর আমরা পেলাম না'।[৬]

খোলাফায়ে রাশেদীনের কত আকাঙ্ক্ষা ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া একটি আংটি ব্যবহারের। কারণ তিনি এই আংটি রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যবহার করতেন। খোলাফায়ে রাশেদীনও সেই আংটি রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যবহার করতেন। কিন্তু সেই আংটিটি পানিতে পড়ে যাওয়ায় তিন দিন পর্যন্ত অনুসন্ধান করেছেন। এমনকি কুপের সব পানি তুলেও অনুসন্ধান করেছেন। কারণ একটিই আর সেটি হল রাসূল (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া একটি আংটি। যদি আংটি মূল্যবান হওয়ার কারণে তারা কুপের ভিতর খুঁজতেন তাহলে তিনদিনে এতগুলো মানুষ যে সময় দিয়েছে, তা আংটির থেকে অনেক মূল্যবান। কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর ব্যবহৃত জিনিসের প্রতি তাদের ভালোবাসা'।[৭]

তাবেঈগণের দৃষ্টান্ত :

ছাহাবীগণ যেভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শের অনুসরণ করতেন তাবেঈগণ ঠিক সেভাবেই ছাহাবীগণের অনুসরণ করতেন। কারণ তারা জানতেন যে, কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র জ্ঞান একমাত্র ছাহাবীগণের কাছেই নির্ভেজাল অবস্থায় পাওয়া যাবে। ইবনু সীরীন (রহঃ) বলেন, كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ عَلَى الطَّرِيقِ مَا كَانَ عَلَى الْأَثَرِ 'তারা (তাবেঈদের সময়কার লোকেরা) মনে করতেন, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন লোক হাদীছের উপর আমল করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত (সঠিক) পথেই থাকবে'।[৮] তাবেঈগণের অনুসরণ করার দৃষ্টান্ত বিভিন্ন হাদীছের গ্রন্থে এসেছে। যেমন-

عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما فَقَالَ أَعْرَابِىٌّ أَخْبِرْنِى قَوْلَ اللَّهِ (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ اللَّهِ) قَالَ ابْنُ عُمَرَ رضى الله عنهما مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللَّهُ طُهْرًا لِلأَمْوَالِ.

১. খালিদ ইবনু আসলাম (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)-এর সাথে বের হলাম। এক মরুবাসী তাঁকে বলল, আল্লাহ তা'আলার বাণী- 'যারা সোনা-ও রূপা জমা করে রাখে এবং তার আল্লাহ্র পথে খরচ করে না-এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। ইবনু ওমর (রাঃ) বললেন, যে ব্যক্তি সম্পদ জমা করে রাখে আর এর যাকাত আদায় করে না, তার জন্য রয়েছে শাস্তি- এ তো ছিল যাকাত বিধান অবতীর্ণ হওয়ার আগের কথা'।[৯]

ইবনু ওমরের সাথীরা তার নিকট থেকে একটি আয়াতের তাফসীর জানার জন্য কতটা উদগ্রীব ছিল। তারা ছাহাবী ইবনু ওমর (রাঃ)-এর থেকে আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা জেনে নিলেন যে, যাকাত দিলে আয়াতে বর্ণিত শাস্তি প্রযোজ্য হবে না।

---

৪. বুখারী হা/১৪০০; মুসলিম হা/২০; মিশকাত হা/১৭৯০।
৫. নববী, শারহু মুসলিম, অত্র হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।
৬. বুখারী হা/৫৮৭৯।
৭. ফাৎহুল বারী ১০/৩২৯ পৃ.।
৮. দারেমী হা/১৪০, সনদ ছহীহ।
৯. বুখারী হা/১৪০৪, ৪৬৬১।

قَالَ نَعَمْ . قَالَ فَأَنْظِرْنِى حَتَّى أُفِيضَ عَلَى رَأْسِى ثُمَّ أَخْرُجَ . فَنَزَلَ حَتَّى خَرَجَ الْحَجَّاجُ، فَسَارَ بَيْنِى وَبَيْنَ أَبِى، فَقُلْتُ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الْوُقُوفَ. فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ صَدَقَ

৩. সালেম (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (খলীফা) আব্দুল মালেক (মক্কার গভর্নর) হাজ্জাজের নিকট লিখে পাঠালেন যে, হজ্জের ব্যাপারে ইবনু ওমর-এর বিরোধিতা করবে না। আরাফার দিনে সূর্য ঢলে যাবার পর ইবনু ওমর (রাঃ) হাজ্জাজের তাঁবুর কাছে গিয়ে উচ্চস্বরে ডাকলেন। আমি তখন তাঁর (ইবনু ওমরের) সাথেই ছিলাম, হাজ্জাজ হলুদ রঙের চাদর পরিহিত অবস্থায় বেরিয়ে আসলেন এবং বললেন, কী ব্যাপার, হে আবু আব্দুর রহমান? ইবনু ওমর (রাঃ) বললেন, যদি সুন্নাতের অনুসরণ করতে চাও তাহলে চল। হাজ্জাজ জিজ্ঞেস করলেন, এ মুহূর্তেই? তিনি বললেন, হ্যাঁ। হাজ্জাজ বললেন, সামান্য অবকাশ দিন, মাথায় পানি ঢেলে বের হয়ে আসি। তখন তিনি তার সওয়ারী হতে নেমে পড়লেন। অবশেষে হাজ্জাজ বেরিয়ে এলেন। এরপর হাজ্জাজ চলতে লাগলেন, আমি ও আমার পিতার মাঝে তিনি চললেন, আমি তাকে বললাম, যদি আপনি সুন্নাতের অনুসরণ করতে চান তাহলে খুৎবা সংক্ষিপ্ত করবেন এবং উকূফে দ্রুত করবেন। হাজ্জাজ আব্দুল্লাহ্‌র দিকে তাকাতে লাগলেন। আব্দুল্লাহ (রাঃ) যখন তাঁকে দেখলেন তখন বললেন, সে ঠিকই বলেছে'।[১৩]

উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালেক বিন মারওয়ানের সুন্নাতের প্রতি কতটা আগ্রহ ছিল যে, তিনি চিঠি লিখে হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে হাদীছের অনুসরণের স্বার্থে ইবনু ওমর (রাঃ)-এর বিরোধীতা করতে নিষেধ করলেন। আর হাজ্জাজের মত শাসকও সুন্নাতকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য নিজের অহমিকা পরিহার করে হজ্জে সুন্নাতের অনুসরণ করলেন। তারা সর্বদা ছাহাবীর অনুসরণ করলেন। কারণ তারা জানতেন একমাত্র ছাহাবীগণের নিকটই সুন্নাত নিরাপদে রয়েছে। মুহাল্লাব বলেন, وفيه أن الأمير يجب أن يعمل فى الدين بقول أهل العلم ويصير إلى رأيهم، 'ইবনু ওমরের হাদীছে এ মর্মে প্রমাণিত হয় যে, আমীরের জন্য আবশ্যক হল দ্বীনের ক্ষেত্রে আহলে ইলম তথা আলেমগণের ফৎওয়া গ্রহণ করা এবং তাদের মতানুসারে নিজেকে পরিচালিত করা'।[১৪]

উপসংহার : উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হল যে, প্রতিটি ক্ষেত্রে সালাফদের অনুসরণ ও অনুকরণ আবশ্যক। কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক জীবন পরিচালনার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে সালাফদের বুঝ অনুযায়ী কুরআনের তাফসীর ও হাদীছের জ্ঞান লাভ করা। আল্লাহ আমাদেরকে সালাফদের অনুকরণ অনুসরণের মাধ্যমে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন পরিচালনার করার তাওফীক দান করুন-আমীন!

عَنْ عِمْرَانَ الضُّبَعِىُّ قَالَ تَمَتَّعْتُ فَنَهَانِى نَاسٌ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما فَأَمَرَنِى، فَرَأَيْتُ فِى الْمَنَامِ كَأَنَّ رَجُلاً يَقُولُ لِى حَجٌّ مَبْرُورٌ وَعُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ سُنَّةَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِى أَقِمْ عِنْدِى، فَأَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِى- قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِمَ فَقَالَ لِلرُّؤْيَا الَّتِى رَأَيْتُ-

২. আবূ জামরাহ নাসর ইবনু ইমরান যুবায়ী (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তামাত্তু হজ্জ করতে ইচ্ছা করলে কিছু লোক আমাকে নিষেধ করল। আমি তখন ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলে তিনি তা করতে আমাকে নির্দেশ দেন। এরপর আমি স্বপ্নে দেখলাম, যেন এক ব্যক্তি আমাকে বলছে, উত্তম হজ্জ ও মাকবূল ওমরাহ। ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট স্বপ্নটি বললাম। তিনি বললেন, তা নবী (ছাঃ)-এর সুন্নাত। এরপর আমাকে বললেন, তুমি আমার কাছে থাক, তোমাকে আমার মালের কিছু অংশ দিব। রাবী শুবাহ (রহঃ) বলেন, আমি (আবূ জামরাকে) বললাম, তা কেন? তিনি বললেন, আমি যে স্বপ্ন দেখেছি সে জন্য'।[১০]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, فَأَتَانِي آتٍ فِي مَنَامِي، فَقَالَ: عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، وَحَجٌّ مَبْرُورٌ، قَالَ: فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي رَأَيْتُ، فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «স্বপ্নে আমার কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, উমরা কবুল হয়েছে এবং হজ্জও কবুল হয়েছে। আমি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে এ স্বপ্নের কথা বললাম। তিনি বললেন, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার! এতো আবূল কাসিম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত'।[১১]

অত্র হাদীছে প্রমাণ করে যে, কোন হাদীছের ব্যাখ্যা বুঝতে না পারলে তাবেঈগণ ছাহাবীগণের নিকট চলে যেতেন। এমনকি স্বপ্ন দেখেও তার ব্যাখ্যা জানার জন্য তারা আলেম ছাহাবীগণের নিকট ছুটে যেতেন। সুন্নাতের সাথে তাবেঈর স্বপ্ন মিলে যাওয়ায় ইবনু আব্বাস (রাঃ) তাকবীর ধ্বনি দিতেন। ইখতিলাফী বিষয়ে তারা বসে না থেকে সঠিক বিষয়টি জানার জন্য ছুটে গেছেন ছাহাবীর নিকট। ছাহাবীগণের অনুসরণে তারা কতটা অগ্রগামী হলে এমন অবস্থা হতে পারে তা অনুমেয়'।[১২]

عَنْ سَالِمٍ قَالَ كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِلَى الْحَجَّاجِ أَنْ لاَ يُخَالِفَ ابْنَ عُمَرَ فِى الْحَجِّ ، فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ رضى الله عنه وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِ الْحَجَّاجِ، فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ فَقَالَ مَا لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ الرَّوَاحَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ . قَالَ هَذِهِ السَّاعَةَ

---

১০. বুখারী হা/১৫৬৭; আহমাদ হা/২১৫৮।
১১. মুসলিম হা/১২৪২।
১২. ফাৎহুল বারী ৩/৪৩১।
১৩. বুখারী হা/১৬৬০।
১৪. ইবনু বাত্তাল, শারহুল বুখারী ৪/৩৩৮।

কোন কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট অধিক প্রিয়তর

-মিনারুল ইসলাম

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

নফল ইবাদতকারীগণ :

মহান আল্লাহ্র রেযামন্দী হাছিলের জন্য ফরয ইবাদতের পাশাপাশি নফলের ইবাদতের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা বিচার দিবসে ফরয ইবাদতের ঘাটতি পূরণে নফল ইবাদত সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। নফল ইবাদত সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীর সঙ্গে দুশমনি রাখবে, আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করব। আমি যা কিছু আমার বান্দার উপর ফরয করেছি, তা আদায়ের মাধ্যমে বান্দা যতটা নৈকট্য লাভ করতে পারবে, তা অন্য কোনভাবে পারবে না। আর আমার বান্দারা নফল ইবাদত করতে করতে আমার এতটা নৈকট্য লাভ করে যে অবশেষে আমি তাকে আমার প্রিয়পাত্র বানিয়ে নেই। আর আমি যখন তাকে প্রিয় করে নেই তখন আমিই তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনে। আমিই তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে। আর আমিই তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে ধরে। আমিই তার পা হয়ে যাই, যা দিয়ে সে চলে। সে যদি আমার কাছে কোন কিছু চায়, তবে আমি নিশ্চয় তাকে তা দান করি। আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে অবশ্যই আমি তাকে আশ্রয় দেই। আমি কোন কাজ করতে চাইলে তা করতে কোন দ্বিধা করি না, যতটা দ্বিধা করি মুমিন বান্দার প্রাণ নিতে। সে মৃত্যুকে অপসন্দ করে আর আমি তার বেঁচে থাকাকে অপসন্দ করি'।[১]

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ নফল ইবাদতকারীগণকে খুবই ভালবাসেন, এমনকি তার প্রতিটি চাওয়া আল্লাহ পূরণ করেন। তাই আসুন! নফল ইবাদত আদায়ে আগ্রহী হই এবং জান্নাতের পথকে সুগম করি।

(ক) নফল ছালাত : যে সমস্ত নফল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জন করা যায় তার অন্যতম হ'ল ছালাত। হাদীছে এসেছে, عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِي سَلْ فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ، قَالَ أَوَغَيْرَ ذَلِكَ؟ قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ، قَالَ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ- রাবী'আ ইবনু কা'ব (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে রাত্রি যাপন করতাম। একদা তার ওযু ও ইস্তেনজার পানি উপস্থিত করলাম। তিনি আমাকে বললেন, তোমার কিছু চাওয়ার থাকলে চাও। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আমি আপনার সাথে জান্নাতে থাকতে চাই। রাসূল (ছাঃ) বললেন, এছাড়া আর কিছু চাও। আমি বললাম, এটাই চাই। তিনি বললেন, তাহ'লে বেশী বেশী সিজদাহ করে আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য কর'।[২]

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বেশী বেশী সিজদার মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে জান্নাতে থাকার সুযোগ রয়েছে। আর রাসূল (ছাঃ) নফল ছালাতের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, রাত দিনে বার রাকা'আত নফল ছালাত আদায় করলে জান্নাতে একটি ঘর নির্মিত হয়। হাদীছে এসেছে, عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ- 'উম্মু হাবীবা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দিন-রাতে বার রাক'আত নফল ছালাত আদায় করবে, তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করা হবে। চার রাক'আত যোহরের পূর্বে, দুই রাক'আত যোহরের পরে, দুই রাক'আত মাগরিবের পরে, দুই রাক'আত এশার পরে এবং ফজরের পূর্বে দু'রাক'আত মোট বার রাক'আত সুন্নাতসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত হ'ল ফজরের পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত'।[৩]

(খ) ফজরের সুন্নাত : রাসূল (ছাঃ) বলেন, رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا- 'ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত ছালাত দুনিয়া ও দুনিয়ার সকল জিনিসের চেয়ে বেশী উত্তম'।[৪]

(গ) ইশরাকের ছালাত : হাদীছে এসেছে, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِيْ جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ- আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ফজরের ছালাত জামা'আতে আদায়

১. *বুখারী হা/৬৫০২; মিশকাত হা/২২৬৬।*

২. *মুসলিম হা/১১২২।*

৩. *তিরমিযী হা/৪১৫; ইবনু মাজাহ হা/১১৪১; মিশকাত হা/১১৫৯।*

৪. *মুসলিম, মিশকাত হা/১১৬৪।*

করল, অতঃপর সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত বসে আল্লাহ্র যিকির করল, অতঃপর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করল, তাহ'লে তার হজ্জ ও ওমরা পালনের পূর্ণ নেকী হ'ল। রাসূল (ছাঃ) 'পরিপূর্ণ' কথাটি তিনবার উচ্চারণ করেছেন'।[৫]

ওমরা ও হজ্জ পালন করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে না। তাই যে ব্যক্তি ফজরের ছালাত আদায় করে যথাস্থানে বসে তাসবীহ-তাহলীল ও যিকির করে। অতঃপর সূর্য উদয় হওয়ার পর দু'রাকা'আত ছালাত আদায় করলে পূর্ণ হজ্জ ও ওমরা পালনের নেকী লাভ হবে।

(ঘ) চাশতের ছালাত : হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِيْ مُوْسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الضُّحَى أَرْبَعًا وَقَبْلَ الأُوْلَى أَرْبَعًا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ- আবু মুসা আল-আশ'আরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি চাশতের চার রাক'আত ছালাত আদায় করে এবং যোহরের পূর্বে চার রাক'আত ছালাত আদায় করে, তার জন্য জান্নাতে ঘর নির্মাণ করা হয়'।[৬]

(ঙ) কুরআন তেলাওয়াত : কুরআন তেলাওয়াত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। কুরআন তেলাওয়াত করলে ঈমান বৃদ্ধি পায়, হৃদয় নরম হয়, মনে আল্লাহভীতি সৃষ্টি হয়। আল্লাহ সম্মান বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ্র রহমত ও বরকত নাযিল হয়। আবার তেলাওয়াত না করার কারণে লাঞ্ছিত করেন। তাই কম করে হলেও নিয়মিত তেলাওয়াত করতে হবে। কেননা তা হ'ল ঈমানী দায়িত্ব।

হাদীছে এসেছে, عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ وَإِلَى جَانِبِهِ حِصَانٌ مَرْبُوطٌ بِشَطَنَيْنِ فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدْنُو وَتَدْنُو وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ– বারা ইবনু আযিব (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি সূরা কাহফ পড়ছিল এবং তার কাছে তার ঘোড়া রশি দ্বারা বাঁধা ছিল। এসময় এক খণ্ড মেঘ তাকে ঢেকে নিল এবং তার অতি নিকটতর হ'তে লাগল। আর তার ঘোড়া লাফাতে লাগল। সে যখন সকালে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে ঘটনা বর্ণনা করল। فَقَالَ تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ بِالْقُرْآنِ 'রাসূল (ছাঃ) বললেন, তা ছিল আল্লাহ্র রহমত ও শান্তি, যা কুরআন তেলাওয়াতের কারণে নেমে এসেছিল'।[৭] অন্য বর্ণনায় এসেছে, تِلْكَ الْمَلاَئِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لَا تَتَوَارَى مِنْهُمْ 'তারা ছিল ফিরিশতা। তোমার কুরআন তেলাওয়াতের শব্দ শুনে নিকটতর হয়েছিল। তুমি যদি পড়তে থাকতে তারা সকাল পর্যন্ত তথায় থেকে যেত এবং মানুষ তাদের দেখতে পেত, তারা মানুষের দৃষ্টি থেকে লুকাতে পারত না'।[৮]

এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, কুরআন তেলাওয়াত করলে আল্লাহ্র রহমত ও শান্তি নাযিল হয়। ফিরিশতারা কুরআন শুনার জন্য দল বেঁধে নেমে আসেন।

হাদীছে এসেছে, وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اقْرَأُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، اقْرَأُوا الزَّهْرَاوَيْنِ: الْبَقَرَةَ، وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ، تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اقْرَأُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ আবু উমামা (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'তোমরা কুরআন তেলাওয়াত কর। কেননা কুরআন ক্বিয়ামতের দিন তেলাওয়াতকারীর জন্য সুফারিশ করতে আসবে। তোমরা দুই উজ্জ্বল সূরা বাক্বারাহ ও আলে ইমরান তেলাওয়াত কর। কেননা ক্বিয়ামতের দিন সূরা দু'টি দু'টি মেঘখন্ড অথবা দু'টি সামিয়ানা অথবা দু'টি পাখা প্রসারিত পাখির ঝাঁকরূপে আসবে এবং পাঠকদের পক্ষে আল্লাহ্র সামনে জোরালো দাবী জানাবে। বিশেষভাবে তোমরা সূরা বাক্বারাহ পড়। কারণ সূরা বাক্বারাহ পড়ার বিনিময় হচ্ছে বরকত আর না পড়ার পরিণাম হচ্ছে আক্ষেপ। অলস ব্যক্তিরাই এ সূরা পড়তে অক্ষম'।[৯]

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরআন ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকট তেলাওয়াতকারীর জন্য সুফারিশ করবে। সূরা বাক্বারাহ ও সূরা আলে ইমরান ক্বিয়ামতের দিন মেঘখন্ডের ন্যায় ছায়া হয়ে থাকবে। সূরা দু'টি পাঠককে জান্নাতে দেয়ার জন্য আল্লাহ্র নিকট জোরালো দাবী করবে। সূরা বাক্বারাহ তেলাওয়াত করলে অর্থ সম্পদে বরকত হবে। আর অলস ব্যক্তিরা এ সূরা পড়তে চায় না।

(চ) ছিয়াম :

ছিয়াম এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, যা করলে কেউ তা দেখতে ও বুঝতে পারে না। স্বয়ং আল্লাহ তা দেখতে পান। এই জন্য তার প্রতিদান আল্লাহ নিজ হাতে দিবেন। হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, كُلُّ عَمَلِ بَنِيْ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِيْ وَأَنَا أَجْزِئ بِهِ– 'মানুষের প্রতিটি ভাল কাজ নিজের জন্য হয়ে থাকে, কিন্তু ছিয়াম শুধুমাত্র আমার জন্য, অতএব আমি নিজেই এর প্রতিদান দেব'।[১০] আবু হুরাইয়রা

৫. সিলসিলা ছহীহাহ হা/৭৪৭।
৬. সিলসিলা ছহীহাহ হা/৭৪৫।
৭. বুখারী হা/৫০১১; মিশকাত হা/২১১৭।
৮. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২১১৬।
৯. মুসলিম, মিশকাত হা/২১২০।
১০. বুখারী হা/১৯০৪।

রাসূল (ছাঃ)-এর একটি হাদীছে তিনি বলেছিলেন, يَا رَسُوْلَ اللهِ مُرْنِيْ بِعَمَلٍ، قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لاَ عَدْلَ لَهُ 'হে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)! আমাকে একটি অতি উত্তম নেক আমলের নির্দেশ দিন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি ছিয়াম পালন কর। কেননা এর সমমর্যাদা সম্পন্ন কোন আমল নেই'।[১১] كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِيْ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ 'মানব সন্তানের প্রতিটি নেক আমলের প্রতিদান দশ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, কিন্তু ছিয়ামের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা ছিয়াম শুধুমাত্র আমার জন্য, আমিই এর প্রতিদান দেব'।[১২]

আবু উমামা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ يَسْتَجِنُّ بِهَا الْعَبْدُ مِنَ النَّارِ 'ছিয়াম ঢাল স্বরূপ। এর দ্বারা বান্দা নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করতে পারে'।[১৩] যে সমস্ত আমলের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভ করা যায় এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যায় তার মধ্যে অন্যতম হ'ল ছিয়াম। রাসূল (ছাঃ) ফরয ছিয়াম ছাড়াও বিভিন্ন নফল ছিয়াম পালন করতেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ– 'সোমবার ও বৃহস্পতিবার বান্দার আমল সমূহ (আল্লাহ্র দরবারে) পেশ করা হয়। অতএব আমি চাই যে, আমার আমল পেশ করা হোক আমার ছিয়াম অবস্থায়'।[১৪]

(ছ) দান-ছাদাকাহ :

দান এমন একটি নফল ইবাদত যার দ্বারা পরিবারে ও সম্পদে আল্লাহ্র রহমত ও বরকত নাযিল হয়। আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে যদি কেউ গোপনে দান করে, তাহ'লে সে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র আরশের ছায়াতলে স্থান পাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, সাত শ্রেণীর ব্যক্তিকে আল্লাহ তার আরশের ছায়াতলে স্থান দিবেন। সেই দিন সেই ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ فَذَكَرَ قَالَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ– 'আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী (ছাঃ) বলেছেন, সাত ধরণের লোককে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ছায়ায় এমন দিনে আশ্রয় দিবেন, যেদিন তার ছায়া ব্যতীত কোন ছায়াই থাকবে না। অতঃপর রাবী পূর্ণ হাদীছটি বর্ণনা করেন। তার মধ্যে আছে (ঐ ব্যক্তি) : 'সে ব্যক্তি যে এমন গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত যা খরচ করে বাম হাত তা জানে না'।[১৫]

(জ) সালাম :

ইসলামে সালামের গুরুত্ব অপরিসীম। সালাম নামক এই শান্তির বাণীটি সামাজিক জীবনে এক বিশাল স্থান দখল করে আছে। রাসূল (ছাঃ) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে সালাম প্রদানকারীর মর্যাদা উল্লেখ করেছেন। যেমন হাদীছে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনে আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল ইসলামে কোন কাজটি সর্বাধিক উত্তম? তিনি বললেন, অন্নহীনকে খাদ্য দেওয়া এবং পরিচিত-অপরিচিত সকলকে সালাম করা'।[১৬]

উক্ত হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, ইসলাম ধর্মে ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম যে ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে খাদ্য খাওয়ায় এবং চেনা-অচেনা সবাইকে সালাম দেয়।

অন্যত্র এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا.أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ 'তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না ঈমান আনায়ন করবে। আর তোমরা ঈমানদার হিসাবে গণ্য হবেনা, যতক্ষণ না তোমরা পরস্পরকে ভালবাসবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন উপায় নির্দেশ করব না যা অবলম্বন করলে তোমাদের পারস্পারিক ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে। তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালামের প্রচলন করবে'।[১৭]

উপরোক্ত হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষের জন্য সরাসরি জান্নাতে প্রবেশ করতে হলে পূর্ণ ঈমানদার হ'তে হবে। আর পূর্ণ ঈমানদার হওয়ার জন্য প্রয়োজন মুসলমানদের একে অপরকে ভালবাসা এবং পরস্পরের মাঝে ভালবাসার মাধ্যম হচ্ছে সালাম। পারস্পারিক সালাম বিনিময়ের মাধ্যমে একে অপরের সাথে ভালবাসা সৃষ্টি হয়। আর এ ভালবাসার মাধ্যমে মু'মিন জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে'।

(চলবে)

[লেখক : শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী]

১১. *নাসাঈ হা/২২২২।*
১২. *মুসলিম হা/১১৫১।*
১৩. *আহমাদ হা/১৫২৯৯।*
১৪. *মিশকাত হা/২০৫৬।*
১৫. *বুখারী হা/১৪২৩; মুসলিম হা/১০৩১; তিরমিযী হা/২২৯১।*
১৬. *বুখারী হা/১১,২৭।*
১৭. *মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩১।*

পারিবারিক বন্ধন

-ড. মুখতারুল ইসলাম

(শেষ কিস্তি)

দুনিয়াতে মানুষের সম্পর্কের প্রথম সংগঠন হল তার পরিবার। অতঃপর সমাজ ও রাষ্ট্রের দেখা মিলে। বনু আদমের কেউই এ ফিৎরাতী সম্পর্ককে অস্বীকার করতে পারে না। নতুবা তার আত্মকেন্দ্রিকতা তাকে ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করবে। দুনিয়াতে সফল ব্যক্তি তো সেই যে পুরো পরিবার ও সমাজকে বুকে আগলে রাখতে পারে মৌচাকের মত। জাতি, গোষ্ঠীর প্রাচীর টপকিয়ে যে ব্যক্তি পুরো বনু আদম তথা পুরো জগতের মানুষের আস্থা অর্জন করতে পারে, ভালবাসা দিতে পারে, ভালবাসা নিতে পারে এবং রহমান প্রদত্ত সম্পর্কের মায়াজালে এক ও অদ্বিতীয় মহান আল্লাহ্র একত্ববাদের উপরে সকলকে দাঁড় করাতে পারে সেই-ই সফল নেতা।

কিন্তু মানুষ শয়তানী ফেরেবে পড়ে সবকিছু জলাঞ্জলী দিতে কছুর করেনা। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ

‘যদি তোমরা (জিহাদ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে সম্ভবতঃ তোমরা জনপদে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে’ *(মুহাম্মাদ ৪৭/২২-২৩)*। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ‘পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ্র সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে এবং যে সম্পর্ক অটুট রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে ও পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, তাদের জন্য রয়েছে অভিসম্পাৎ এবং তাদের জন্য রয়েছে মন্দ আবাস’ *(রা‘দ ১৩/২৫)*।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা‘আলা আত্মীয়তার সম্পর্ক, ভালোবাসা ও পারিবারিক বন্ধন সৃষ্টির নিমিত্তে الرَّحِم থেকে নিজের নাম ধারণ করেছেন রাহীম ও রহমান হিসাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا اللَّهُ، وَأَنَا الرَّحْمَنُ، خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنِ اسْمِي، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ ‘কল্যাণময় মহান আল্লাহ বলেছেন, আমি আল্লাহ, আমিই রহমান। আমিই ‘রহিম’কে সৃষ্টি করেছি। ‘রহিম’ নামটি আমার রহমান নাম থেকে পরিসৃত। সুতরাং যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক বহাল রাখবে, আমি তাকে আমার রহমতের সাথে সংযুক্ত করব। আর যে ব্যক্তি আত্মীয়তাকে ছিন্ন করবে, আমি তাকে আমার রহমত থেকে ছিন্ন করব’।[১]

রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا ‘সে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী হিসাবে গণ্য হবে না যে কেউ তার সাথে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করলেই সে তার সাথে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে। বরং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী সে ব্যক্তি যে কেউ তার সাথে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করলেও সে তার সাথে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে’।[২]

পারিবারিক বন্ধন মহান আল্লাহ্র অপার দান। অনেক সময় এর গুরুত্ব না বুঝেই সামান্য কারণেই আমরা তা ছিন্ন করি ফেলি। মানুষের মাঝে যদি ভালবাসার বন্ধন টিকে না থাকে, তবে প্রকৃতার্থে মানুষ ও পশুর মাঝে খুব বেশী ফারাকের জায়গা বাকী থাকবে না। হাদীছে এসেছে, وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ. فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ. আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার এমন কিছু আত্মীয়-স্বজন রয়েছে যাদের সাথে আমি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করি; অথচ তারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। আমি তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করি; অথচ তারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে। আমি তাদের সাথে ধৈর্যের পরিচয় দেই; অথচ তারা আমার সাথে কঠোরতা দেখায়। অতএব তাদের সাথে এখন আমার করণীয় কী? তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, ‘তুমি যদি সত্যি কথাই বলে থাকো তা হলে তুমি যেন তাদেরকে উত্তপ্ত ছাই খাইয়ে দিচ্ছো। আর তুমি যতদিন পর্যন্ত তাদের সাথে এমন ব্যবহার করতে থাকবে ততদিন আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে তাদের ওপর তোমার জন্য একজন সাহায্যকারী নিযুক্ত থাকবে’।[৩] রাসূল (ছাঃ) বলেন, بُلُّوا أَرْحَامَكُمْ وَلَوْ بِالسَّلَامِ ‘অন্ততপক্ষে সালাম বিনিময় করে হলেও তোমরা তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করো’।[৪]

---

১. *আবুদাউদ, মিশকাত হা/৪৯৩০।*
২. *বুখারী, আবুদাউদ, মিশকাত হা/৪৯২৩।*
৩. *মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯২৪।*
৪. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৭৭৭; ছহীহুল জামে‘ হা/২৮৩৮।*

পারিবারিক বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখার উপকারিতাসমূহ

নেক আমল কবুলের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ

প্রত্যেক মানুষ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য আমলে ছালেহ বা নেক আমলসমূহ করে থাকে। কিন্তু ব্যক্তির ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ ও যাকাত তার অজান্তেই মহান আল্লাহর দরবারে পৌঁছাতে পারে না। কেননা সে অনেক বড় ঈমানদার ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও শয়তান সুকৌশলে তাকে সম্পর্কহীনতার পাপে জড়িয়ে আত্মীয় ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। প্রকারান্তরে সে মহান আল্লাহর সাথেই সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকে।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ: مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ، وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ 'রহীম তথা আত্মীয়তা আল্লাহ তা'আলার আরশের নীচে ঝুলন্ত আছে এবং বলছে যে ব্যক্তি আমাকে বহাল রাখবে আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক বহাল রাখবে। আর যে ব্যক্তি তা ছিন্ন করবে, আল্লাহ তার সাথে ছিন্ন করবে'।[৫]

ফলে তার নেক আমলসমূহ যত সুন্দরই হৌক না কেন তা প্রভুর নিকট কবুলযোগ্য নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ أَعْمَالَ بَنِى آدَمَ تُعْرَضُ كُلَّ خَمِيسٍ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَلاَ يُقْبَلُ عَمَلُ قَاطِعِ رَحِمٍ. 'আদম সন্তানের আমলসমূহ প্রতি বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রিতে (আল্লাহ তা'আলার নিকট) উপস্থাপন করা হয়। তখন আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীর আমল গ্রহণ করা হয় না'।[৬]

পারিবারিক বন্ধন অটুট রাখা পরিপূর্ণ মুমিনের পরিচায়ক

বিবেকবান ঈমানদাররা আত্মীয়তার সম্পর্কের ব্যাপারে অত্যন্ত যত্নবান হয়। পাশাপাশি তারা সার্বিক বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করে। বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ অনুকূল-প্রতিকূল সব পরিস্থিতিতে পরকালের জবাবদিহিতার ভয় করে। আল্লাহ্র ভয় এবং পরকালে জবাবদিহিতার ভয় মানুষকে বিশ্বাস ও বিবেক নির্দেশিত পথে পরিচালিত করে। আল্লাহ তা'আলা সত্যিকার পরিপূর্ণ মুমিনের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ 'আর আল্লাহ যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে বলেছেন যারা তা অক্ষুণ্ন রাখে এবং ভয় করে তাদের পালনকর্তাকে ও ভয় করে কঠিন হিসাবকে' *(রা'দ ১৩/২১)*।

হাদীছে এসেছে, খায়ছামা গোত্রের একজন লোক বলল, قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: إِيمَانٌ بِاللَّهِ. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثُمَّ مَهْ؟ قَالَثُمَّ صِلَةُ الرَّحِمِ. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَبْغَضُ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: ثُمَّ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: ثُمَّ الْأَمْرُ بِالْمُنْكَرِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمَعْرُوفِ 'আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে উত্তম আমল কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনায়ন করা। আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখা। আমি আবার বললাম, আল্লাহ্র নিকট কোন কাজটি অপ্রিয়? তিনি বললেন, শিরক করা। আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, সম্পর্ক ছিন্ন করা। তারপর কোনটি? তার জবাবে তিনি বললেন, খারাপ কাজের আদেশ করা এবং ভাল কাজে নিষেধ করা'।[৭]

রাসূল (ছাঃ) অন্যত্র বলেন, مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. وَفِي رِوَايَةٍ بَدَلَ: (الْجَارِ) : وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন অবশ্যই মেহমানের সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন অবশ্যই প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন অবশ্যই ভাল কথা বলে নতুবা চুপ থাকে। অন্য বর্ণনায় 'প্রতিবেশী'র স্থলে রয়েছে'। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন অবশ্যই আত্মীয়স্বজনের হক আদায় করে'।[৮]

রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ. 'তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে পরিপূর্ণ মুমিন ঐ ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে উত্তম চরিত্রবান এবং তার পরিবারের প্রতি দয়াবান'।[৯]

আবেদ ও মা'বূদের সম্পর্কের কেন্দ্রস্থল

যদি কোন বান্দা আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় করতে চায়, তবে তাকে পারিবারিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করণের পথে হাটতে হবে। তবেই সে তার চাওয়া অনুযায়ী মহান আল্লাহ্র সাড়া পাবে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ فَأَخَذَتْ بِحَقْوَي الرَّحْمَنِ فَقَالَ: مَهْ، قَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ. قَالَ أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى يَا رَبِّ! قَالَ: فَذَاكَ. 'আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিকুল সৃজন শেষে আত্মীয়তার বন্ধন (দাঁড়িয়ে) বলল, এটিই হচ্ছে সম্পর্ক বিচ্ছিন্নতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনাকারীর

৫.বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯২১।
৬.আহমাদ হা/১০২৭৭।
৭.মুসনাদে আবু ইয়ালা হা/৬৮৩৯; তারগীব ওয়াত তারহীব ৩/৩৩৬ পৃ.।
৮. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪২৪৩।
৯. আহমাদ হা/২৪৭২১; মুসতাদরাকে হাকেম হা/১৭৩।

স্থান। আল্লাহ তা'আলা বললেন, হ্যাঁ, ঠিকই। তুমি কি এ কথায় সন্তুষ্ট নও যে, আমি ওর সঙ্গেই সম্পর্ক স্থাপন করবো যে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করবে এবং আমি ওর সাথেই সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করবো যে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করবে। তখন সে বলল, আমি এ কথায় অবশ্যই রাযী আছি হে আমার রব! তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, তা হলে তোমার জন্য তাই হৌক'।[১০]

ব্যক্তির জান্নাত ও জাহান্নামের পথ নির্দেশক

বেহেশত থেকে আসা পবিত্র এ পারিবারিক বন্ধনকে ছিন্ন করলে বনু আদমকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা দিয়ে তিনি বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ 'সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে যাবেনা'।[১১] রাসূল (ছাঃ) অন্যত্র বলেন, ثَلاَثَةٌ لاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ وَقَاطِعُ رَحِمٍ وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ 'তিন ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না। নেশাগ্রস্ত মদ্যপায়ী, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী ও যাদুতে বিশ্বাসী'।[১২]

আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ دُلَّنِى عَلَى عَمَلٍ أَعْمَلُهُ يُدْنِينِى مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُنِى مِنَ النَّارِ. قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ وَتَصِلُ ذَا رَحِمِكَ فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنْ تَمَسَّكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ. 'জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, (হে নবী!) আপনি আমাকে এমন একটি আমল বাতলিয়ে দিন যা আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে দিবে। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করবে, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না। ছালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে ও নিজ আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করবে। লোকটি রওয়ানা করলে রাসূল (ছাঃ) তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, সে যদি আদিষ্ট বিষয়গুলো আঁকড়ে ধরে রাখে তাহলে সে জান্নাতে যাবে'।[১৩]

সুসংহত ও কল্যাণকামী জাতি

ইসলাম মানুষের পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় রাখার শিক্ষা দেয়। ইসলাম অন্য মানুষের প্রতি দয়া ও কল্যাণকামিতা শিখায়। তাই ইসলাম মানুষের পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করতে আদেশ করে এবং তা যে কোনো কারণে ছিন্ন করতে নিষেধ করে। আর এভাবেই একটি মুসলিম পরিবার ও সমাজ পারস্পরিক সুসম্পর্কের ভিত্তিতে দৃঢ়, দয়াশীল ও পরকল্যাণকামী হয়। যা অন্য কোনো আধুনিক সমাজে দেখা যায় না। ইসলাম দেখিয়েছে কিভাবে মুহাজির ও আনছাররা পরস্পর পরস্পরে পারিবারিক সম্পর্কে জড়িয়েছিল। হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا، ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. 'আবু মুসা (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য ইমারতের মত। যার একাংশ অপরাংশকে সুদৃঢ় করে। এটা বলে তিনি এক হাতের আঙ্গুল অপর হাতের আঙ্গুলের মধ্যে প্রবেশ করালেন'।[১৪]

দুনিয়াবী কামিয়াবী :

মানুষের যাবতীয় পাপ কর্মের শাস্তি নির্ধারিত হবে হিসাব দিবসে। কিন্তু সম্পর্কহীনতা ও অত্যাচারের শাস্তি মহান আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতেই দিবেন।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ ذَنْبٍ أَحْرَى أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ. 'দু'টি গুনাহ্ ছাড়া এমন কোনো গুনাহ্ নেই যে গুনাহ্গারের শাস্তি আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেই দিবেন এবং তা দেওয়াই উচিৎ। উপরন্তু তার জন্য আখিরাতের শাস্তি তো আছেই। গুনাহ দু'টি হচ্ছে- অত্যাচার ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা'।[১৫]

তাহলে একজন ব্যক্তি পারিবারিক সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখার মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতী নিশ্চিত শাস্তি থেকে বাঁচতে পারে। মহান আল্লাহ্র ক্রোধ থেকে বাঁচতে আত্মীয়তা ও পারিবারিক সম্পর্কই একজন মানুষকে তার দুনিয়াবী প্রভূত কল্যাণ দান করতে পারে।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ 'যে ব্যক্তি নিজ জীবিকার প্রশস্ততা ও মরণে বিলম্ব কামনা করে, সে যেন আত্মীয়-স্বজনের সাথে উত্তম ব্যবহার করে'।[১৬]

রাসূল (ছাঃ) অন্যত্র বলেন, مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِى عُمْرِهِ وَيُوَسَّعَ لَهُ فِى رِزْقِهِ وَيُدْفَعَ عَنْهُ مَيْتَةُ السُّوءِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. 'যে ব্যক্তি নিজ মরণে বিলম্ব, জীবিকার প্রশস্ততা এবং অপমৃত্যু কামনা না করে, সে যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে উত্তম ব্যবহার করে'।[১৭]

---

১০. বুখারী, মুসলিম,মিশকাত হা/৪৯১৯।
১১. বুখারী হা/৫৯৮৪; তিরমিযী হা/১৯০৯; মিশকাত হা/৪৯২২।
১২. আহমাদ হা/১৯৫৮৭।
১৩. মুসলিম হা/১৪।
১৪. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫৫।
১৫. তিরমিযী, আবুদাউদ, মিশকাত হা/৪৯৩২।
১৬. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯১৮।
১৭. আহমাদ হা/১২১২; তারগীব ওয়াত তারহীব ৩/৩৩৫ পৃ.; মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৮/১৫২,১৫৩ পৃ.।

আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেন, تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ، فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ، مَنْسَأَةٌ فِي الْأَثَرِ. 'তোমরা নিজ বংশ সম্পর্কে জানবে, যাতে তোমরা আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করতে পার। কারণ আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করলে আত্মীয়-স্বজনদের ভালোবাসা পাওয়া যায় এবং ধন-সম্পদ ও বয়স বৃদ্ধি পায়'।[১৮]

শুধু তাই নয় পরিবার, সমাজ ও দেশের হৃদয়তন্ত্রীতে মৃত্যুর পরে স্থায়ীভাবে জায়গা করে নিতে এবং দুনিয়াবাসীর দো'আ পেতে পরিবার ও আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় করার বিকল্প নেই।

কীভাবে পারিবারিক বন্ধন রক্ষা পাবে?

পারিবারিক বন্ধন রক্ষা করার কিছু দিকনির্দেশনা নিম্নে উল্লেখ করা হল-

পরিবারের সদস্যবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে বার বার সাক্ষাৎ করা, তাদের খবরাখবর নেওয়া, তাদের সম্পর্কে কাউকে জিজ্ঞাসা করা, তাদেরকে মাঝে মধ্যে কোনো কিছু উপঢৌকন দেওয়া, তাদেরকে যথোপযুক্ত সম্মান করা, তাদের গরীবদেরকে ছাদাকা-খায়রাত এবং ধনীদের সাথে নম্র ব্যবহার করা, তাদের বড়দেরকে সম্মান করা এবং ছোট ও দুর্বলদের প্রতি দয়া করা, তাদেরকে আপ্যায়ন করা, তাদেরকে সম্মানের সাথে গ্রহণ করা, তাদের মধ্যে যারা আপনার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে তাদের সাথে সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

সেই সাথে তাদের বিবাহ-শাদীতে অংশ গ্রহণ করা, তাদের দুঃখ-দুর্দশায় পাশে থাকা, তাদের জন্য দো'আ করা, তাদের সাথে প্রশস্ত অন্তরের পরিচয় দেওয়া, তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-বিগ্রহ নিরসনের চেষ্টা করা তথা তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে আরো সুদৃঢ় করা, তাদের রুগ্নের সেবা করা, তাদের দাওয়াত গ্রহণ করা, হেদায়াতের দিকে ডাকা এবং তাদেরকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা ইত্যাদি।

তবে আত্মীয়-স্বজনদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে একটি কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, তাদের সাথে কখনো কোনোভাবেই দুর্ব্যবহার করা যাবে না। বরং তাদেরকে নম্রতা, কৌশল এবং সদুপদেশের মাধ্যমে ধর্মের দিকে ধাবিত করতে হবে। ইসলামের দাওয়াত দিতে গিয়ে কখনো তাদের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়া যাবে না। তবে একান্তভাবে তা কখনো করতে হলে ভালোভাবেই করবে।

অনেক দাঈদেরকেই এমন দেখা যায় যে, তার আত্মীয়-স্বজন ও বংশীয়দের মাঝে তার কোনো প্রভাব নেই। তা এ কারণে হতে পারে যে, তিনি তাদেরকে ধর্মের প্রতি দাওয়াত দেওয়ার ব্যাপারে কোনো গুরুত্বই দেন না অথবা তাদেরকে দাওয়াত দেয়ার ব্যাপারে সুন্দর পন্থা অবলম্বন করেন না। তা কখনোই ঠিক নয়। বরং তাদের সামনে বিনম্রভাবে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে যথাযথ গুরুত্ব ও সম্মান দেখাবে। তাহলেই তারা তাকে ভালোভাবে গ্রহণ করবে। তেমনিভাবে প্রত্যেক পরিবার ও বংশের কর্তব্য হল- তাঁদের আলিমদেরকে সম্মান করা, তাঁদের কথা শুনা, তাঁদেরকে নগণ্য মনে না করা। কারণ তাঁদের সম্মান তাঁদের বংশেরই সম্মান।

পারিবারিক বন্ধন রক্ষা করার উপায়সমূহ

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহতে পারিবারিক বন্ধন রক্ষার যথাযথ পন্থা বাতলিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিম্নে এ বিষয়ে কিছু টিপস উল্লেখ করা হল-

১. এ বন্ধন রক্ষা করলে দুনিয়া ও আখিরাতের যে যে লাভগুলো পাওয়া যায় তা সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে। কারণ, কোনো বিষয়ের ফলাফল ও পরিণতি জানলেই তা করার সদিচ্ছা জন্মে এবং তা করতে মানুষ অধিক আগ্রহী হয়। অতএব সে বিষয়ে সকলকে অবহিত করা উচিৎ।

২. এ বন্ধন ছিন্ন করার ভয়ানক পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে। কারণ তা ব্যক্তি জীবনে একদা বিশেষ চিন্তা, বিষণ্নতা, লজ্জা ও আফসোস বয়ে আনে। কেননা কোনো জিনিসের ভয়ানক পরিণতির কথা জানা থাকলেই তো তা থেকে দূরে থাকা সহজ হয়।

৩. এ ব্যাপারে সর্বদা আল্লাহ তা'আলার একান্ত সহযোগিতা কামনা করতে হবে। কারণ একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই বান্দার সকল কাজ সহজ করে দিতে পারেন।

৪. আত্মীয়-স্বজনদের দুর্ব্যবহারকে নিজে ভালো ব্যবহার ও দয়া দিয়ে মোকাবিলা করতে হবে। কেননা ইসলাম সর্বদা ধৈর্য ও ক্ষমার শিক্ষা দিয়ে থাকে। জান্নাত পেতে পরিবারের প্রতিটি সদস্যের পদক্ষেপ সেদিকেই ধাবিত হবে।

৫. আত্মীয়-স্বজনদের খুঁটিনাটি ভুলচুকের কৈফিয়তসমূহ মেনে নিতে হবে। কারণ মানুষ বলতেই তো ভুল হওয়া একান্তই স্বাভাবিক। এ ব্যাপারে ইউসুফ (আঃ)-এর রেখে যাওয়া জ্বলন্ত আদর্শের কথা মাঝে মাঝে স্মরণ করা যেতে পারে। কেননা তিনি এতো কিছুর পরও তাঁর ভাইয়েরা যখন তাদের কৃতকর্মের জন্য তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়েছে. তখন তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। বরং তিনি তাদের ক্ষমার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট একান্তভাবে ফরিয়াদও করেছেন।

৬. আত্মীয়-স্বজনরা নিজেদের ভুলের জন্য ক্ষমা না চাইলেও নিজের উদারতাবশতঃ তাদেরকে ক্ষমা করে দিতে হবে এবং তাদের দোষ-ত্রুটিসমূহ একেবারেই ভুলে যেতে হবে। কারণ তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উন্নত মানসিকতা ও পরম সাহসিকতার পরিচয় বহন করে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি তো সেই যে নিজ আত্মীয়-স্বজনকে ক্ষমা করে দেয় এবং তাদের দোষ-ত্রুটিগুলো একেবারেই ভুলে যায়।

৭. নিজ আত্মীয়-স্বজনদের সাথে নম্রতা ও ভদ্রতার পরিচয় দিতে হবে। কারণ এতে করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনরা তাকে অধিকহারে ভালোবাসবে এবং তার নিকটবর্তী হওয়ার জন্য সর্বদা চেষ্টা করবে।

৮. আত্মীয়-স্বজনদের খুঁটিনাটি ভুলচুক সমূহ নিজ চোখে দেখেও তা না দেখার ভান করতে হবে এবং তা নিয়ে কখনো ব্যতিব্যস্ত হওয়া যাবে না। আর এভাবেই তো পরস্পরের

১৮. তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৯৩৪।

ভালোবাসা দীর্ঘ দিন টিকে থাকে এবং পরস্পরের শত্রুতা ধীরে ধীরে লোপ পায়। আর এটি হচ্ছে উন্নত মানসিকতা ও স্বচ্ছতার পরিচায়ক। এতে করে মানুষের মান-সম্মান ক্রমেই বাড়তে থাকে। কখনো তা কমে না।

৯. যথাসাধ্য আত্মীয়-স্বজনদের খেদমত করার চেষ্টা করতে হবে। চাই তা সরাসরি হোক অথবা নিজের ধন-সম্পদ ও পদ-মর্যাদা দিয়েই হোক না কেন।

১০. আত্মীয়-স্বজনদেরকে কখনো নিজ অনুগ্রহের খোঁটা দেওয়া যাবে না। এমনকি তাদের থেকে সমপর্যায়ের আচরণও আশা করা যাবে না। কারণ ইতোপূর্বেই বলা হয়েছে, সে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী হিসাবে গণ্য হবে না, যে ব্যক্তি কেউ তার সাথে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করলেই কেবল সে তার সাথে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে।

১১. আত্মীয়-স্বজনদের সাথে অল্পতে তুষ্ট থাকার নীতি অবলম্বন করতে হবে। কারণ এ নীতি অবলম্বন করলেই আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা সহজতর হয়। নতুবা নয়।

১২. আত্মীয়-স্বজনদের অবস্থা ও মানসিকতা বুঝেই তাদের সাথে অনুরূপ আচরণ করতে হবে। কারণ আত্মীয়-স্বজনদের কেউ কেউ তো এমনও রয়েছে যে, তার সাথে বছরে অন্তত একবার সাক্ষাৎ এবং মাঝে মাঝে সামান্য ফোনালাপই যথেষ্ট। আবার কেউ কেউ তো এমনও রয়েছে যে, তার সাথে মাঝে মাঝে কিছু হাসিখুশি কথা বললেই সে তাতে খুব খুশী। আবার কেউ কেউ এমনও রয়েছে যে, তার সাথে বারবার সাক্ষাৎ দিতে হয় এবং সর্বদা তার খবরাখবর নিতে হয়। নতুবা সে রাগ করে। অতএব আত্মীয়দের প্রত্যেকের সাথে তার মেজায অনুযায়ী আচরণ করতে হবে। তা হলেই তাদের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা অতি সহজেই সম্ভবপর হবে।

১৩. আত্মীয়দের সাথে আপ্যায়নে বাড়াবাড়ি করা যাবে না। কারণ আত্মীয়-স্বজনরা যখন দেখবে আপনি তাদের আপ্যায়নে বাড়াবাড়ি করছেন না, তখন তারা বারবার আপনার সাথে সাক্ষাতে উৎসাহী হবে। আর যখন তারা দেখবে আপনি তাদের আপ্যায়নে বাড়াবাড়ি করছেন তখন তারা আপনার সাথে বারবার সাক্ষাতে সঙ্কোচ বোধ করবে এই মনে করে যে, তারা আপনার সাথে বারবার সাক্ষাৎ করে আপনাকে বিরক্ত করছে না তো?

১৪. কোনো কারণে আত্মীয়-স্বজনদের কাউকে একান্ত তিরস্কার করতে হলে তা হালকাভাবে করতে হবে। কারণ সত্যিকারার্থে ভদ্র ব্যক্তি সেই, যে মানুষের অধিকারগুলো পুরোপুরিভাবে আদায় করে এবং নিজের অধিকারগুলো প্রয়োজন বোধে ছেড়ে দেয়। যাতে করে আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে পারস্পরিক সম্প্রীতি বজায় থাকে। তবে নিজের অধিকার খর্ব হওয়ার দরুণ কাউকে একান্ত তিরস্কার করতে হলেও তা হালকাভাবে করতে হবে।

১৫. আত্মীয়-স্বজনদের তিরস্কার সহ্য করতে হবে এবং তার একটি সুন্দর ব্যাখ্যাও বের করতে হবে। এটি হচ্ছে সত্যিকারার্থে বিশিষ্ট গুণীজনদেরই চরিত্র। যাঁদের মধ্যে মানবিক যাবতীয় গুণাবলী বিদ্যমান এবং যারা শীর্ষস্থানীয় চরিত্রবান তারাই তো সমাজের অত্যন্ত ধৈর্যশীল ব্যক্তিবর্গই হয়ে থাকেন। তাদের কোনো আত্মীয়-স্বজন তাদেরকে তিরস্কার করলে তারা মনে করেন, তাঁদের উক্ত আত্মীয় সত্যিই তাদেরকে অত্যাধিক ভালোবাসেন এবং তাদের বারবার আসা-যাওয়া ও সাক্ষাৎ তিনি অবশ্যই কামনা করেন। তাই তারা তাদের উক্ত আত্মীয়ের নিকট তাদের কৃত অপরাধ স্বীকার করেন। কারণ দুনিয়াতে কিছু লোক তো এমনও রয়েছে যে, তারা অন্যদেরকে খুবই ভালোবাসেন ঠিকই। তবে তারা অন্যের কোনো দোষ-ত্রুটি দেখলেই তাকে খুবই তিরস্কার করে।

১৬. আত্মীয়-স্বজনদের সাথে যে কোনো ধরনের হাসি-ঠাট্টা করতে তাদের সার্বিক অবস্থার প্রতি খেয়াল রাখতে হবে এবং তাদের মধ্যে যারা হাসি-ঠাট্টা মোটেই পসন্দ করে না তাদের সাথে তা মোটেও করা যাবে না।

১৭. আত্মীয়-স্বজনদের সাথে কোনোভাবেই বাগবিতণ্ডা ও তর্ক-বিতর্কে জড়িয়ে পড়া যাবে না। কারণ তা ধীরে ধীরে পরস্পরের মাঝে বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি করতে পারে। বরং তাদের সাথে এমন সকল আচরণ করা থেকে দূরে থাকতে হবে, যা সাধারণত পারস্পরিক সম্প্রীতি বিনষ্ট করে।

১৮. কখনো নিজ আত্মীয়-স্বজনদের কারোর সাথে কোনো ধরণের ঝগড়া-বিবাদ ঘটে গেলে যথাসাধ্য আকর্ষণীয় উপঢৌকনের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যকার পূর্বের ভাব ও সম্পর্ক ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে। কারণ হাদিয়া ও উপঢৌকন এমন একটি জিনিস যা পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি করে এবং পরস্পরের মধ্যকার ভুল ধারণাসমূহ নিরসন করে।

১৯. সর্বদা এ কথা মনে রাখবে যে, আত্মীয়-স্বজনরা হচ্ছে নিজের শরীরের একটি অংশের ন্যায়। সুতরাং তাদেরকে পরিত্যাগ করা কখনোই সম্ভবপর নয়। বরং তাদের সম্মানই নিজের সম্মান এবং তাদের অসম্মানই নিজের অসম্মান। বহুদিনে গড়ে উঠা এ সম্পর্ক যেন কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

২০. সর্বদা এ কথা মনে রাখবে যে, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা সত্যিই একটি নিকৃষ্ট কাজ। কেউ এতে নিজকে লাভবান মনে করলেও মূলতঃ সে ক্ষতিগ্রস্ত এবং কেউ এতে নিজকে বিজয়ী মনে করলেও মূলতঃ সে পরাজিত।

২১. বিয়ে-শাদী, আক্বীকা ইত্যাদি তথা যে কোনো অনুষ্ঠানে আত্মীয়-স্বজনদেরকে দাওয়াত দেওয়ার প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে। এ জন্য সহজ উপায় হচ্ছে, প্রত্যেকেই নিজের সকল আত্মীয়-স্বজনদের একটি তালিকা সংরক্ষণ করবে। যাতে থাকবে তাদের নাম কিংবা মোবাইল নম্বর। আর যখনই কোনো অনুষ্ঠান করার চিন্তা করবে তখনই উক্ত তালিকা খুলে সবাইকে যথাসাধ্য দাওয়াত দেয়ার চেষ্টা করতে হবে। চাই তা সরাসরি হোক অথবা টেলিফোনের মাধ্যমে। যদি কোনো আত্মীয় কোনোভাবে উক্ত দাওয়াত থেকে বাদ পড়ে যায় তা হলে অতি দ্রুত নিজের ভুল স্বীকার করে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে এবং তাকে যে কোনোভাবে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করতে হবে।

২২. আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে কোনো ধরনের সমস্যা ঘটে গেলে তাদের মধ্যে যাকে আল্লাহ তা'আলা সবার ভালোবাসা কুড়ানোর সুযোগ দিয়েছেন তাকে উক্ত সমস্যা দূর করার জন্য দ্রুত এগিয়ে যেতে হবে। তা না করলে একদা উক্ত সমস্যা বড় থেকে বড় হয়ে সবাইকেই জড়িয়ে ফেলবে। পারিবারিক সম্পর্ক নষ্ট হবে।

২৩. নিজেদের মধ্যকার কেউ মারা গেলে তার রেখে যাওয়া সম্পত্তি দ্রুত ওয়ারিছদের মাঝে বন্টন করে দিতে হবে। যেন কারোর ওয়ারিছী সম্পত্তি নিয়ে ওয়ারিছী আত্মীয়-স্বজনদের পরস্পরের মাঝে দ্বন্দ্ব-বিগ্রহ সৃষ্টি না হয়।

২৪. আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যকার যৌথ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সবাই নিজেদের মধ্যে সর্বদা একতা ও সমঝোতার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। আমানতদারিতা, সত্যবাদিতা, পরস্পর দয়া, ভালোবাসা ও পরামর্শ এবং অন্যকে নিজের উপর অগ্রাধিকার দেয়ার প্রতি সর্বদা যত্নবান হতে হবে। প্রত্যেকে অন্যের জন্য তাই ভালোবাসবে যা নিজের জন্য ভালোবাসে এবং প্রত্যেকে নিজের অধিকারের পাশাপাশি অন্যের অধিকারের প্রতিও যত্নবান হবে।

কখনো কোনো সমস্যা অনুভূত হলে তা অত্যধিক সুস্পষ্টতার সাথে বিশেষ পর্যালোচনার মাধ্যমে সমাধান করার চেষ্টা করতে হবে। প্রত্যেককেই নিষ্ঠার সাথে কাজ করার চেষ্টা করতে হবে। অন্যের কাজের প্রতি বেশী দৃষ্টি দেয়া যাবে না। যে কোনো ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে কোনো সিদ্ধান্ত হলে তা লিখে রাখার চেষ্টা করতে হবে। এভাবে চলতে থাকলে ইনশাআল্লাহ তাদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রহমত ও বরকত নাযিল হবে এবং নিজেদের মধ্যকার ভালোবাসা দীর্ঘ দিন অটুট থাকবে।

২৫. মাসে, ছয় মাসে অথবা বছরে অন্তত একবার হলেও আত্মীয়-স্বজনরা সবাই কোথাও না কোথাও একত্রিত হওয়ার চেষ্টা করবে। এভাবে সবাই একত্রিত হলে পরস্পর পরিচিতি, সহযোগিতা ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। বিশেষ করে উক্ত বৈঠকগুলোর নেতৃত্বে যদি থাকে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানরা থাকে। দুই ঈদের কোন এক ঈদে এ সুযোগ নেওয়া যেতে পারে।

২৬. আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য নিজেদের মধ্যে সর্বদা একটি ফান্ড রাখা উচিত। তাতে সবার পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট হারে মাসিক চাঁদা, নিজেদের মধ্যকার ধনীদের বিশেষ দান-ছাদাকা সংগ্রহ করা যেতে পারে। আত্মীয়-স্বজনদের কেউ কোনো সমস্যায় পড়লে তা বিশেষভাবে পর্যালোচনা করে সে ব্যাপারে তাকে যথাযোগ্য সহযোগিতা করতে হবে। এতে করে পরস্পরের মাঝে ভালোবাসা জন্মাবে ও বৃদ্ধি পাবে।

২৭. আত্মীয়-স্বজনদের একটি ফোন বুক তৈরী করে তা কপি করে সবার মাঝে বিতরণ করা ভাল। উক্ত ফোন বুকটি সর্বদা নিজ আত্মীয়-স্বজনকে স্মরণ করিয়ে দিবে। এতে করে ফোনের মাধ্যমে আত্মীয়-স্বজনদের খবরাখবর নেওয়া এবং তাদেরকে বিশেষ অনুষ্ঠানাদিতে দাওয়াত দেয়া সহজ হবে। আত্মীয়তার বন্ধনও রক্ষা পাবে।

২৮. আত্মীয়-স্বজনদের যে কাউকে বার বার বিরক্ত করা ও ঝামেলায় ফেলা থেকে বিরত থাকতে হবে। কাউকে তার সাধ্যাতীত কিছু করতে বার বার বিরক্ত করা যাবে না। বিশেষ করে আত্মীয়-স্বজনদের কেউ যদি উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা বা ধনী ব্যক্তি হোন তাহলে তাদেরকে এমন কাজ করতে চাপ সৃষ্টি করা যাবে না, যা তাদের সাধ্যের বাইরে অথবা কষ্টসাধ্য। যদি তারা কোনো কারণে কারোর কোন আবদার রক্ষা করতে না পারে তাহলে তাদেরকে কোন তিরস্কার করা যাবে না। বরং তাদেরকে এ ক্ষেত্রে অপারগ মনে করতে হবে।

২৯. আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে পারস্পরিক পরামর্শ আদান-প্রদানের সুব্যবস্থা থাকা উচিত। বরং তাদের মাঝে একটি স্থায়ী মজলিসে শুরা থাকলে তা আরো ভালো হয়। যাতে করে কারোর কোনো বড় সমস্যা দেখা দিলে তাদের উপযুক্ত পরামর্শ নেয়া যায় এবং এমন এক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যাতে আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট থাকবেন। উপরন্তু আত্মীয়-স্বজনরাও সবাই খুশী থাকবে। তবে মজলিসে শুরার সদস্যরা এমন হতে হবে যাদের রয়েছে অত্যাধিক দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতা, ধৈর্য ও যথাসময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দুর্বার ক্ষমতা। এক কথায় সাংগঠনিক পরিবার ও আবহাওয়াতে নিজেকে জড়ানো।

৩০. তবে উপরোক্ত সকল বিষয়ে এ কথার খেয়াল রাখতে হবে যে, যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক হয় একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য এবং পারস্পরিক সহযোগিতা হয় পরোপকার ও আল্লাহভীরুতার ভিত্তিতে। যেন তা জাহেলী যুগের বংশ ও আত্মীয় প্রেমের ভিত্তিতে না হয়।

জার্নাল অব ফ্যামিলি সাইকোলজিতে প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, যাদের পারিবারিক বন্ধন বেশী শক্তিশালী, তারা তুলনামূলকভাবে রোগে কম আক্রান্ত হচ্ছেন। অন্যদিকে পরিবারের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক খারাপ, তারা বেশী মাত্রায় অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। বয়স্ক লোকদের মধ্যে যারা রোগাক্রান্ত, তাদের পারিবারিক ইতিহাস খুঁজে দেখা গেছে, প্রত্যেকেই পরিবারের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করছেন না।

সমীক্ষাটির প্রধান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাসের সহযোগী অধ্যাপক সারারাহ বি উডস বলেন, আমরা দেখেছি পরিবারের আবেগঘন পরিবেশ ব্যক্তির স্বাস্থ্যে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। এ ছাড়া ২০ বছর পার হয়ে যাওয়ার পর তার স্ট্রোক হতে পারে এবং এটি মাথা ব্যাথায়ও প্রভাব ফেলে।

আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কগুলোকে আরো শক্তিশালী করা উচিৎ। অবসর সময়ে ভার্চুয়াল জগতে পড়ে না থেকে পরিবারের লোকদের সঙ্গে সময় কাটানো, তাদের বোঝার চেষ্টা করা এবং তাদের সঙ্গে ভালো আচরণ করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা সকলকে পারিবারিক আত্মীয়তার এই পরম বন্ধনটুকু ছিন্ন করা থেকে সর্বদা বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন এবং ঈমানের ভিত্তিতে এক প্রাণ ও এক মন হয়ে পরিবারের অনন্য সাধারণ সদস্য হিসাবে কবুল করুন-আমীন!

[লেখক : কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]

আদর্শবান স্বামীর প্রতি উপদেশ

-মফীযুল ইসলাম

শুরুর কথা :

আদি পিতামাতা হযরত আদম (আঃ) এবং হাওয়া (আঃ)-এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ এ বসুন্ধরা আবাদ শুরু করেন। যারা দুনিয়াতে আদর্শ স্বামী-স্ত্রী হিসাবে মানবতার শিক্ষাগুরু স্বরূপ প্রেরিত হয়েছিলেন। পারিবারিক রূপ-কাঠামো অদ্যবধি সেরূপই রয়ে গেছে। মানব সভ্যতার মৌলিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ ভালবাসার এই বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠানটি চলবে ইসলামের শারঈ জ্ঞানের ভিত্তিতে। একজন স্বামী হচ্ছেন পরিবারের প্রধান কর্তা। একটি আর্দশ পরিবার গঠনে যার দায়িত্ব বহুবিধ। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা একজন আদর্শবান স্বামীর দায়িত্ব ও কর্তব্য আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

পরিবারের আদি কথা :

মহান আল্লাহ বলেন, ‘হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। যিনি তোমাদেরকে একজন মানুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর ঐ দু’জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন’ *(নিসা ৪/১)*।

এরপর তাদের পারিবারিক জীবন জান্নাত থেকে শুরু হয়। মহান আল্লাহ বলেন, وَقُلْنَا يَاآدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ– অতঃপর আমরা বললাম, হে আদম তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে অবস্থান কর এবং সেখান থেকে যা চাও খুশীমনে খাও। কিন্তু তোমরা দু’জন এই গাছটির নিকটে যেয়ো না। তাহ’লে তোমরা সীমা লংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। *(বাক্বারাহ ২/৩৫)*।

তারা উভয়ে নির্বিঘ্নে জান্নাতে বসবাস করতে থাকলো। অতঃপর শয়তান তাদেরকে ফুসলিয়ে আল্লাহর নির্দেশের লঙ্ঘন করিয়ে তাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি করলো। আদম ও হাওয়া (আঃ) তাদের ভুল বুঝতে পেরে আল্লাহর কাছে তাওবা করেন। অতঃপর আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করেন এবং দুনিয়াতে উত্তম পারিবারিক বন্ধন তৈরির সুযোগ করে দেন।

আল্লাহ বলেন, قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ‘আমরা বললাম, তোমরা সবাই জান্নাত থেকে নেমে যাও। অতঃপর যখন আমার নিকট থেকে তোমাদের কাছে কোন হেদায়াত পৌঁছবে, তখন যারা আমার হেদায়াতের অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিত হবে না’ *(বাক্বারাহ ২/৩৮)*।

স্ত্রীর অধিকার সমূহ :

সামাজিক ও ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে একজন স্ত্রীর রয়েছে নানাবিধ অধিকার। যেমন-

১. মোহরের অধিকার :

স্ত্রীর যে সকল অধিকার আদায় হওয়া আবশ্যক তন্মধ্যে মোহরের অধিকার অন্যতম। বিবাহের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী সবচেয়ে কাছের মানুষ হয়। শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে স্ত্রীকে মোহর প্রদান করা ওয়াজিব। মহান আল্লাহ বলেন, فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ‘তাকে তার ফরয মোহরানা প্রদান কর’ *(নিসা ৪/২৪)*। আল্লাহ বলেন, وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ‘তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহরানা ফরয হিসাবে প্রদান কর’ *(নিসা ৪/৪)*।

মোহর বাবদ স্ত্রীকে টাকা-পয়সা জমি-জায়গা, স্বর্ণ-রৌপ্য, কাপড়-চোপড়, কুরআন শিক্ষাদানও মোহর দেওয়া যেতে পারে’।[১]

খাদিজা (রাঃ)-এর মোহর ছিল ২০টি উটনী। আয়েশা (রাঃ)-এর মোহর ছিল ৫০০ দিরহাম রৌপ্য মুদ্র। সাফিয়্যাহ (রাঃ)-এর মোহর ছিল তার মুক্তি। উম্মে হাবীবা (রাঃ)-এর মোহর ছিল ৪০০০ দিরহাম, যা বাদশাহ নাজাশী আদায় করে দিয়েছিলেন’।[২]

২. ভরণ পোষনের অধিকার :

মহান আল্লাহ বলেন, وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ– জন্মদাত্রী মাতাগণ তাদের সন্তানদের পূর্ণ দু’বছর দুধ পান করাবে, যদি তারা দুধপানের মেয়াদ পূর্ণ করতে চায়। আর জন্মদাতা পিতার দায়িত্ব হ’ল ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রসূতি মায়েদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা। সাধ্যের অতিরিক্ত কাউকে বাধ্য করা যাবে না। আর সন্তানের কারণে প্রসূতি মাকে এবং জন্মদাতা পিতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। উত্তরাধিকারীদের প্রতিও একই বিধান। তবে যদি পিতা-মাতা পরস্পরে সম্মতি ও পরামর্শের ভিত্তিতে বাচ্চার দুধ ছাড়াতে চায়, তাহ’লে তাদের উপর কোন দোষ বর্তাবে না। আর যদি তোমরা অন্যের কাছে তোমাদের সন্তানদের দুধপান করাতে চাও, তাহ’লে তাকে সমর্পণের সময় ন্যায়সঙ্গতভাবে কিছু প্রদান করায় কোন দোষ নেই। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রেখ যে, তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ তা প্রত্যক্ষ করেন *(বাক্বারাহ ২/২৩৩)*।

---

১. *বুখারী, মিশকাত হা/৩২০২-৩২০৯।*
২. *বুখারী হা/৩৭১; ৪২০০।*

সুতরাং স্বামী তার সাধ্যমত স্ত্রী-পরিজনের জন্য যাবতীয় ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৩. খাওয়া ও পরার চাহিদা পূরণ :

আল্লাহ বলেন, وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا– 'তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহরানা ফরয হিসাবে প্রদান কর। তবে তারা যদি তা থেকে খুশী মনে তোমাদের কিছু দেয়, তাহ'লে তা তোমরা সন্তুষ্টচিত্তে স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ কর' *(নিসা ৪/৩৪)*।

স্ত্রী যদি ভালো খেতে চায়, ভালো পরতে চায়, এজন্য তার উপর ক্ষেপে না গিয়ে প্রথমত তার এই উন্নত মানসিকতার জন্য ধন্যবাদ জানান। মনে রাখবেন, আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম বলেন, সব সময় একই ধরনের খাবার গ্রহণ করা নবী (ছাঃ) এর পবিত্র সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কেননা সর্বদা একই খাদ্য গ্রহণ স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। দ্বিতীয়ত সে আপনার সাধ্যের বাইরে কিছু দাবি করলে উত্তম পন্থায় নিজের আয়ের কথা বলে বুঝানোর চেষ্টা করুন।

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ،

মুআবিয়াহ ইবনে হাইদা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কারো উপর স্ত্রীর অধিকার কতটুকু? তিনি বললেন, তুমি খেলে তাকে খাওয়াবে এবং তুমি পরলে তাকে পরাবে'।[৩]

বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূল (ছাঃ) হাযার হাযার জনতার সামনে স্বামীর দায়িত্ব তুলে ধরে বলেন, أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ শুনে রেখো, তোমাদের উপর স্ত্রীদের অধিকার হ'ল তাদেরকে উত্তমরূপে খেতে-পরতে দিবে'।[৪] আল্লাহ বলেন, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ– 'স্ত্রীদের উপর যেমন স্বামীদের হক্ব আছে তেমনি স্বামীদের উপরেও স্ত্রীদের অধিকার রয়েছে' *(বাক্বারাহ ২/২২৮)*।

খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রে ইসলামী আদবের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। খাওয়ার পূর্বে বিসমিল্লাহ বলে ও একত্রে খাবার গ্রহণে বরকত আছে'।[৫]

ওয়াহশী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমরা আহার করি, কিন্তু পরিতৃপ্ত হ'তে পারি না। তিনি বলেন, তোমরা হয়ত পৃথক পৃথকভাবে আহার করো। তারা বলেন, হ্যাঁ। তিনি বলেন, فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ– 'তোমরা একত্রে আহার করো এবং আহারকালে আল্লাহর নাম স্মরণ কর অর্থাৎ বিসমিল্লাহ বল, তাহলে তোমাদের খাদ্যে তোমাদের জন্য বরকত দেয়া হবে'।[৬] এছাড়া খাবার প্রস্তুতকারীকে সাথে নিয়ে খাওয়া অথবা তা থেকে কিছু প্রদান করা রাসূলের (ছাঃ) সুন্নাত'।[৭]

সুতরাং এসকল হাদীছ থেকে বুঝা যায় পরিবারের কর্তা স্ত্রী-পরিজনকে নিয়ে একত্রে খাবার গ্রহণ করলে আল্লাহ খাবারে বরকত দিবেন। স্ত্রীর মুখে এক লোকমা খাবার তুলে দিলেও তাতে ছাদাক্বার নেকী লাভ হবে'।[৮]

এছাড়াও পরিবারে পিছনে ছওয়াবের প্রত্যাশায় বৈধ পন্থায় যা কিছু ব্যয় করা হোক না কেন তাতে ছাদাক্বার নেকী হবে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ، دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ– 'ছাওয়াবের দিক দিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ দীনার সেটি, যে দীনারটি ব্যক্তি তার পরিবারের উপর খরচ করে'।[৯]

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, একটি দীনার তুমি আল্লাহর পথে ব্যয় করলে, একটি দীনার গোলাম আযাদ করার জন্য করলে, একটি দীনার মিসকীনকে দান করলে এবং আর একটি তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করলে। এর মধ্যে ঐ দীনারটিই উত্তম, যা তুমি তোমার পরিবারের জন্য ব্যয় করলে'।[১০]

অপর এক হাদীছে রয়েছে, عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلاَّ أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ সা'দ ইবনু আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) তাকে বলেছেন, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তুমি যে সম্পদই ব্যয় করো তার জন্য তুমি পুরস্কার হবে। এমন কি তুমি যে খাবার তোমার স্ত্রীকে খাওয়াও, তার জন্য তুমি পুরস্কৃত হবে'।[১১]

আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ– 'বল, আমার প্রতিপালক তার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা রূযী বাড়িয়ে দেন ও সংকুচিত করেন। আর তোমরা যা কিছু (তাঁর পথে) পথে ব্যয় করবে, তিনি তার বদলা দিবেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ রূযীদাতা' (সাবা ৩৪/৩৯)।

---

৩. আবুদাঊদ হা/২১৪২; ইবনু মাজাহ হা/১৮৫০, হাদীছ হাসান।
৪. তিরমিযী হা/১১৬৩; ইবনু মাজাহ হা/১৮৫১; হাদীছ হাসান।
৫. তিরমিযী হা/১৮৫৮; ইবনু মাজাহ হা/৩২৬৪, ছহীহ।
৬. ইবনু মাজাহ হা/৩২৮৬; হাদীছ হাসান।
৭. বুখারী হা/৫৪৬০, ২৫৫৭, মুসলিম হা/১৬৬৩; ইবনু মাজাহ হা/৩২৮৯।
৮. বুখারী হা/৫৬।
৯. মুসলিম হা/৯৯৪; তিরমিযী হা/১৯৬৬।
১০. মুসলিম হা/২২০১।
১১. বুখারী হা/৬৭৩৩।

অন্য বর্ণনায় আছে, ‘তুমি নিজেকে, সন্তানদেরকে, স্ত্রীকে ও খাদেমকে যা খাওয়াবে তা তোমার জন্য ছাদাক্বা’।[১২]

সুতরাং একজন ন্যায়পরায়ণ আদর্শবান পরিবারের কর্তা এসব ছওয়াবের কথা খেয়াল রেখে পরিবারের পিছনে খরচ করবেন, মোটেও কৃপণতা করবেন না। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ– ‘যে পাপী হওয়ার জন্য এইটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার উপর নির্ভরশীলদের রিযিক নষ্ট করে’।[১৩]

সব কিছুর সুন্দর ব্যবস্থা থাকার পরও যদি স্ত্রী অকৃতজ্ঞ হয়, তাহ’লে মনে রাখতে হবে এটা তার স্বভাব বা প্রকৃতি’।[১৪]

রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ ‘সেই ব্যক্তি আল্লাহ্র শুকরিয়া করে না, যে মানুষের শুকরিয়া করে না’।[১৫] অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ لَمْ يَشْكُرِ الْقَلِيلَ لَمْ يَشْكُرِ الْكَثِيرَ ‘যে ব্যক্তি অল্প পেয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে বেশী পেলেও কৃতজ্ঞ হবে না’।[১৬]

অল্পে তুষ্ট থাকার মধ্যেই রয়েছে সুখী জীবনের ঠিকানা। যা স্ত্রীকে বুঝাতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি ইসলাম কবুল করেছে এবং তার নিকট নুন্যতম রিযিক রয়েছে ও আল্লাহ তাকে তাতে সন্তুষ্ট থাকার তাওফীক দিয়েছেন, সেই সফলকাম হয়ে গেছে’।[১৭]

তিনি আরো বলেন, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ ‘সেই ব্যক্তি কতইনা সৌভাগ্যবান যাকে ইসলামের পথে হেদায়াত দান করা হয়েছে এবং তার জীবিকা নূন্যতম প্রয়োজন মাফিক ও সে তাতেই খুশি’।[১৮]

বহু স্ত্রী লোক আল্লাহ প্রদত্ত নে’মত ও স্বামীর অবদান বুঝতে পারে না। দূর থেকে দেখে অপর নারী সুখে আছে, ভালো খায়, ভালো পরে এবং বিলাসে ভেসে চলে। এগুলো দেখে চিন্তা করে পরিবারে অশান্তি বাড়ায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, (সুখে থাকতে চাও) ‘তাহ’লে পার্থিব ব্যাপারে তোমাদের চেয়ে কম সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিবর্গের দিকে দৃষ্টি দাও এবং তোমাদের চেয়ে অধিক সমৃদ্ধশালী লোকদের দিকে তাকিওনা। তাহলে তোমাদেরকে দেয়া আল্লাহর নে’মত তোমাদের নিকট তুচ্ছ মনে হবে না’।[১৯]

আল্লাহ ও আখিরাতকে কবুলকারী স্ত্রীগণ কখনও অধিক অধিক ভরণ-পোষণের দাবীদার হন না। দুনিয়ার ক্ষুদ্র স্বার্থের কাছে আখিরাত বিক্রয় করে দেন না।

৪. বাসস্থানের অধিকার :

আল্লাহ বলেন, أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ‘তোমরা তাদের থাকতে দাও যেখানে তোমরা থাক, তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী। তোমরা তাদের ক্ষতি করো না কষ্ট দেওয়ার জন্য। যদি তারা গর্ভবতী হয়, তাহ’লে তাদের জন্য ব্যয় করবে, যতদিন না গর্ভ খালাস হয়। যদি তারা তোমাদের সন্তানদের দুধ পান করায়, তাহ’লে তোমরা তাদের পারিশ্রমিক দাও। আর এ বিষয়ে তোমরা আপোষে সুন্দরভাবে পরামর্শ করবে। কিন্তু যদি তোমরা সংকট সৃষ্টি কর, তাহ’লে অন্য নারী তাকে স্তন্য দান করাবে’ *(তালাক্ব ৬৫/৬)*।

পর্দা দ্বারা আবেষ্টিত গৃহ হ’ল স্ত্রীর মান-সম্মান ইজ্জত-আব্রুর ও সম্ভ্রম রক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। যেখানে অবস্থান করে মার্জিত-ভদ্র, শালীন স্ত্রী নিজের সম্ভ্রম রক্ষা করবে এবং তাসবীহ-তাহলীল, তাকবীর, তাহমীদ, কুরআন তেলাওয়াত ও ফরজ-নফল ছালাত আদায় করে গৃহকে সজীব করে রাখবে। এজন্য দায়িত্ববান স্বামী স্ত্রী-পরিজনের জন্য পর্দায় ঘেরা প্রশস্ত বাড়ি তৈরি করবেন। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء– ‘একজন মুসলমানের জন্য প্রশস্ত বাসগৃহ, সৎপ্রতিবেশী ও আরামদায়ক বাহন সৌভাগ্যের নিদর্শন’।[২০]

একটি মুসলিম পরিবারে কর্তার আবশ্যকীয় দায়িত্ব হ’ল স্ত্রী-পরিজনের জন্য আবদ্ধ গোসল খানা নির্মাণ করা। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার স্ত্রীকে গণগোসলখানায় প্রবেশ না করায়’।[২১]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে একথা বলতে শুনেছি, الحمَّام حرام على نساء أمتي ‘আমার উম্মাতের নারীদের জন্য হাম্মাম অর্থাৎ জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত গোসলখানায় প্রবেশ করা হারাম’।[২২]

অন্যত্র তিনি বলেন, مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا هَتَكَتِ السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا– ‘যে নারী স্বামীর গৃহ ছাড়া অন্যত্র কাপড় খুলবে সে তার ও তার প্রভুর মাঝের পর্দা ধ্বংস করে দিবে’।[২৩] **[চলবে]**

[সাংগঠনিক সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, ঝিনাইদহ সাংগঠনিক যেলা]

---

১২. ছহীহ আত-তারগীব হা/১৯৫৫।
১৩. আবু দাঊদ হা/১৬৯২; হাসান ।
১৪. বুখারী হা/৪৩১, ৭৪৮।
১৫. আবু দাউদ হা/৫৮১১, তিরমিযী হা/১৯৫৪।
১৬. ছহীহ আত-তাগরীব হা/৯৭৬, হাসান ছহীহ।
১৭. মুসলিম হা/২৩১৬; ইবনু মাজাহ হা/৪১৩।
১৮. তিরমিযী হা/২৩৪৯; হাদীছ ছহীহ।
১৯. তিরমিযী হা/২৫১৩।
২০. আদাবুল মুফরাদ হা/১১৬।
২১. তিরমিযী হা/২৮০১; নাসাঈ হা/১৯৮; তারগীব হা/১৬৪।
২২. ছহীহ আত-তারগীব হা/১৬৫, সনদ ছহীহ।
২৩. আবুদাঊদ হা/৪০১০; তিরমিযী হা/২৮০৩; হাদীছ ছহীহ।

ইসলামের প্রথম সমাচার

-আসাদ বিন আব্দুল আযীয

(শেষ কিস্তি)

রাসূল (ছাঃ) দ্বারা প্রথম আমীর নির্বাচন :

হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক যুদ্ধে রাসূল (ছাঃ) আব্দুল্লাহ বিন যাহশকে আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। তিনিই ছিলেন রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক মনোনীত ইসলামের প্রথম আমীর'।[১]

ইসলামের প্রথম বিজিত রাষ্ট্র :

আব্দুল্লাহ ইবনু ইমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে ছিলাম তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কোন শহরটি প্রথম বিজয় লাভ হবে কন্সটান্টিনোপোল না রোম? তখন রাসূল (ছাঃ) বলেছিলেন, বরং হিরাকিল শহর অর্থাৎ কন্সটান্টিনোপোল'।[২]

সিজদার আয়াত সম্বলিত প্রথম সূরা :

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَوَّلُ سُوْرَةٍ أُنْزِلَتْ فِيْهَا سَجْدَةٌ وَالنَّجْمِ قَالَ فَسَجَدَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَسَجَدَ مَنْ خَلْفَهُ إِلَّا رَجُلًا رَأَيْتُهُ أَخَذَ كَفًّا مِنْ تُرَابٍ فَسَجَدَ عَلَيْهِ فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قُتِلَ كَافِرًا وَهُوَ أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ.

'আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, সিজদার আয়াত সম্বলিত অবতীর্ণ হওয়া সর্বপ্রথম সূরা হ'ল আন-নাজম। এ সূরা পাঠকালে রাসূল (ছাঃ) সিজদা করলেন এবং সিজদা করলেন তাঁর পেছনের সকল লোক। তবে এক ব্যক্তিকে আমি দেখলাম, এক মুষ্টি মাটি হাতে তুলে তাতে সিজদা করছে। এরপর আমি তাকে কাফের অবস্থায় নিহত হ'তে দেখেছি। সে হল 'উমাইয়াহ ইবনু খালফ।[৩]

মক্কায় প্রথম প্রকাশ্যে কুরআন তেলাওয়াতকারী ব্যক্তি :

উরওয়া বিন যুবাইর তার পিতা হ'তে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ)-এর পর প্রথম মক্কায় প্রকাশ্যে কুরআন তেলাওয়াত করেছিলেন আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)।[৪]

অপর বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ)-এর মুখনিসৃত তেলাওয়াত থেকে প্রথম ব্যক্তি হিসাবে মক্কায় তেলাওয়াত করেছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)।[৫]

আল্লাহ্র রাস্তায় প্রথম তীর নিক্ষেপকারী :

হযরত কায়েস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমি সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, আমি প্রথম আরব ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় তীর নিক্ষেপের ক্ষেত্রে'।[৬] অপর এক বর্ণনায় এসেছে, আবুল কাসেম বিন আব্দুর রহমান বলেন, আল্লাহ্র পথে প্রথম তীর নিক্ষেপকারী হলেন, সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস'।[৭]

ইসলামের প্রথম মুওয়াযযিন :

হযরত বেলাল (রাঃ) ছিলেন ইসলামের প্রথম মুওয়াযযিন। কাসেম বিন আব্দুর রহমান বলেন, ইসলামের প্রথম মুওয়াযযিন হলেন, হযরত আবু বকরের আযাদকৃত গোলাম হযরত বেলাল (রাঃ)।[৮]

আল্লাহ্র পথে ঘোড়া নিয়ে ছোটা প্রথম ব্যক্তি :

আবুল কাসেম বিন আব্দুর রহমান বলেন, أول من عدا به المقداد بن الأسود فرسه في سبيل الله من المسلمين رضي الله عنه 'মুসলমানের মধ্যে আল্লাহ্র পথে ঘোড়া নিয়ে ছোটা প্রথম ব্যক্তি ছিলেন মিক্বদাদ বিন আমর'।[৯] অপর এক বর্ণনায় আলী (রাঃ) বলেন, বদর যুদ্ধের দিন আমাদের মধ্যে একমাত্র ঘোড়সওয়ার ব্যক্তি ছিলেন মিক্বদাদ'।[১০]

ইসলামের প্রথম লি'আনকারী :

মুহাম্মাদ (রহঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আমি একটি বিষয়ে আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম। আমার ধারণা ছিল যে, আমি যা জানতে চাই সে বিষয়ের জ্ঞান তার কাছে আছে। আনাস (রাঃ) বলেন, হিলাল ইবনু উমাইয়্যাহ (রাঃ) শারীক ইবনু সাহমার সাথে তার স্ত্রীর সম্পর্কে যিনার অভিযোগ আনলেন।

তিনি ছিলেন বারা ইবনু মালিকের বৈপিত্রেয় ভাই। ইসলামে ইনিই সর্বপ্রথম লি'আন করেন। রাবী বলেন, তিনি তার স্ত্রীর সঙ্গে লি'আনের মাধ্যমে সমাধা করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমার ঐ মহিলার প্রতি নযর রাখবে। যদি

---

১. *ইবনু হিশাম ২/৪৯ পৃ.; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৩/২৫০ পৃ.; আল মা'আরিফ ১৬৭০ পৃ.; উসদুল গাবা ৩/১৯৫ পৃ.।*
২. *আহমাদ ২/১৭৬ পৃ.; দারেমী ১/১২৬ পৃ.; ইবনু আবী শায়বা ৪৭/১৫৩ পৃ.; হাতেম ৩/৪২২ পৃ.; ছহীহাহ ১/৮ পৃ.।*
৩. *বুখারী হা/৪৮৬৩।*
৪. *ইবনু আসাকির ৩৩/৭৫ পৃ.; ইবনু হিশাম ২/৮০ পৃ.।*
৫. *ইবনু সা'দ ৩/১২০ পৃ.; তাবারানী হা/৮৯৬১; ইবনু আবী শায়বা ১৪/৭৯ পৃ., সনদ ছহীহ।*
৬. *আহমাদ হা/১৩১৫; ইবনু আবী শায়বা ১২/৮৭,১৪/৮৭ পৃ.; আস-সুন্নাহ (ইবনু আবী আছেম) হা/১৪০৭; আবু নাঈম ফিল মা'রুফ হা/৫০৭-৫০৮) সনদ ছহীহ।*
৭. *ইবনু সা'দ ৩/১০৪ পৃ.; ইবনু আসাকির ৪৩/৩৭৯ পৃ.।*
৮. *ইবনু সা'দ ৭/২৭০ পৃ.; তাবারানী হা/৮৯৬১।*
৯. *ইবনু সা'দ ৩/১২০ পৃ.; ইবনু আসাকির ৪৩/৩৭৯ পৃ.; ইবনু আবি শায়বা ১৪/৭৯ পৃ.; সনদ ছহীহ।*
১০. *ইবনু সা'দ ৩/১২০; আবু নাঈম ফি মা'রিফাতু লিছ ছাহাবা হা/৬১৬৮।*

সে সোজা চুলধারী উজ্জ্বল বর্ণের লাল চোখ বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে তাহ'লে সে হিলাল ইবনু উমাইয়ার ঔরসজাত সন্তান। আর যদি সে (মহিলা) সুরমা চোখ বিশিষ্ট কোঁকড়ানো চুল, পায়ের চিকন নলা বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে তাহ'লে সে শারীক ইবনু সাহমার সন্তান। রাবী আনাস (রাঃ) বলেন, আমি জানতে পারলাম যে, ঐ মহিলাটি সুরমা চোখ বিশিষ্ট কুঞ্চিত কেশধারী সরু নলা বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করেছে'।[১১]

ইসলামের প্রথম যিহার :

খুওয়াইলাহ বিনতু মালিক ইবনু ছা'লাবাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার সাথে আমার স্বামী আওস বিন ছামেত (রাঃ) যিহার করলেন। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে অভিযোগ করলাম। তিনি আমার স্বামীর পক্ষ থেকে আমার সাথে বিতর্ক করলেন এবং বললেন, আল্লাহকে ভয় করো, সে তো তোমার চাচার ছেলে। মহিলাটি বলেন, আমি সেখান থেকে চলে না আসতেই কুরআনের এ আয়াত অবতীর্ণ হ'ল, قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا 'নিশ্চয় আল্লাহ ঐ মহিলার কথা শুনতে পেয়েছেন, যে তার স্বামীর ব্যাপারে তোমার সাথে বিতর্ক করছে' *(মুজাদালাহ ৫৮/১)*। এখান থেকে কাফফারাহ পর্যন্ত অবতীর্ণ হ'ল। অতঃপর তিনি বললেন, সে একটি দাস মুক্ত করবে। মহিলাটি বলেন, তার সে সামর্থ্য নেই। তিনি বললেন, সে একাধারে দু'মাস ছিয়াম পালন করবে। মহিলাটি বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল! সে খুবই বৃদ্ধ, ছিয়াম পালন করতে অক্ষম। তিনি বললেন, তবে ষাটজন মিসকীনকে আহার করাবে। মহিলাটি বললেন, ছাদাক্বা করার মতো পয়সাও তার নেই।

মহিলাটি বলেন, এ সময় সেখানে এক ঝুড়ি খুরমা আসলো। তখন আমি (মহিলা) বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! এ পরিমাণ আর এক ঝুড়ি খুরমা আমি তাকে সহযোগিতা করবো। তিনি বললেন, তুমি ভালই বলেছো। তুমি এর দ্বারা তার পক্ষ থেকে ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াও এবং তোমার চাচাতো ভাইয়ের কাছে ফিরে যাও'।[১২]

মক্কা বিজয়ের পর প্রথম জামা'আতের ইমাম :

ইবনু জুরাইজ (রহঃ) বলেন, আমার নিকট বর্ণিত হয়েছে যে, মক্কা বিজয়ের পর মক্কায় প্রথম জামা'আতের ছালাত আদায় করেন হুবাইরা বিন সাবল বিন আজলানী (রাঃ)। মক্কা বিজয়ের সময় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাকে মানুষদের নিয়ে ছালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর হুবাইরা (রাঃ) ছাকিফ গোত্রের লোক ছিলেন'।[১৩]

উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর প্রথম গণীমত গ্রহণ করা বৈধকরণ :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لأَحَدٍ سُودِ الرُّءُوسِ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانَتْ تَنْزِلُ نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتَأْكُلُهَا قَالَ سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ فَمَنْ يَقُولُ هَذَا إِلاَّ أَبُو هُرَيْرَةَ الآنَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ وَقَعُوا فِي الْغَنَائِمِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ لَهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَوْلاَ كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, আছে যে, নবী (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী কোন উম্মাতের লোকদের জন্য গণীমতের সম্পদ বৈধ ছিল না। আকাশ হ'তে আগুন অবতীর্ণ হত এবং তা পুড়িয়ে ফেলত। বর্ণনাকারী সুলাইমান আল-আমাশ বলেন, আজকের দিনে এ হাদীছ আবু হুরায়রা (রাঃ) ব্যতীত আর কে বলতে পারে? বদর যুদ্ধ সংঘটিত হলে লোকেরা গণীমতের মাল ব্যবহারে লিপ্ত হন, অথচ গণীমতের মাল তখন পর্যন্ত তাদের জন্য বৈধ ঘোষিত হয়নি। তখন আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ করেন, 'যদি (গণীমত ও মুক্তিপণ গ্রহণ তোমাদের জন্য হালাল হওয়ার ব্যাপারে) পূর্বেই লিখিত না থাকত, তাহলে (ফিদইয়া স্বরূপ) তোমরা যা নিয়েছ, সেজন্য তোমাদের উপর ভয়ংকর শাস্তি আপতিত হত' *(আনফাল ৮/৬৮)*।[১৪]

কবরে মানুষের যে অঙ্গটি প্রথম পঁচে দুর্গন্ধময় হবে :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ أَوَّلَ مَا يُنْتِنُ مِنَ الإِنْسَانِ بَطْنُهُ فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ إِلاَّ طَيِّبًا فَلْيَفْعَلْ 'মানুষের দেহের যে অংশ প্রথম দুর্গন্ধময় হবে, তা হ'ল তার পেট। সুতরাং যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখে যে একমাত্র পবিত্র (হালাল) খাদ্য ছাড়া আর কিছু সে আহার করবেনা, সে যেন তাই করতে চেষ্টা করে'।[১৫]

কে প্রথম সিঙ্গায় ফুৎকার শুনবে?

উবাইদুল্লাহ ইবনু মু'আয আল আম্বারী (রহঃ) ইয়াকুব ইবনু আসিম ইবনু উরওয়াহ ইবনু মাসউদ আছ-ছাকাফী (রহঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ)-কে আমি এ কথা বলতে শুনেছি যে, একদা জনৈক লোক তার কাছে এসে বললেন, এ কেমন হাদীছ আপনি বর্ণনা করছেন যে, এত এত দিনের মধ্যে ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে। এ কথা শুনে তিনি বললেন, 'সুবহানাল্লাহ অথবা 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ' অথবা অনুরূপ কোন শব্দ। তারপর তিনি বললেন, আমি তো শুধু এ কথাই বলেছিলাম যে, অচিরেই তোমরা এমন ভয়াবহ ঘটনা প্রত্যক্ষ করবে যা ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দিবে। এ ঘটনা কায়েম হবেই হবে।

এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমার উম্মতের মধ্যেই দাজ্জালের আবির্ভাব হবে এবং সে চল্লিশ পর্যন্ত অবস্থান করবে। আমি জানি না চল্লিশ দিন, না চল্লিশ মাস, না চল্লিশ বছর। এ সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মারইয়াম তনয় ঈসা

১১. *মুসলিম হা/১৪৯৬; নাসাঈ হা/৩৪৬৪।*
১২. *আবু দাউদ হা/২২১৪।*
১৩. *আখবারু মক্কা ২০১৬ পৃ.; আল-ইছাবাহ ৬/২৮১ পৃ.।*
১৪. *তিরমিযী হা/৩০৮৫।*
১৫. *বুখারী হা/৭১৫২।*

(আঃ)-কে প্রেরণ করবেন। তাঁর আকৃতি উরওয়াহ ইবনু মাসঊদ-এর অবিকল প্রতিরূপ হবে। তিনি দাজ্জালকে সন্ধান করে তাকে ধ্বংস করে দিবেন। তারপর সাতটি বছর লোকেরা এমনভাবে অতিবাহিত করবে যে, দুই ব্যক্তির মধ্যে কোন শত্রুতা থাকবে না। তখন আল্লাহ তা'আলা সিরিয়ার দিক হ'তে শীতল বাতাস প্রবাহিত করবেন। ফলে যার হৃদয়ে কল্যাণ বা ঈমান থাকবে, এ ধরনের কোন লোকই এ দুনিয়াতে আর বেঁচে থাকবে না। বরং এ ধরনের প্রত্যেকের জান আল্লাহ তা'আলা কবয করে নিবেন। এমনকি তোমাদের কোন লোক যদি পর্বতের গভীরে গিয়ে আত্মগোপন করে তবে সেখানেও বাতাস তার কাছে পৌঁছে তার জান কবয করে নিবে।

আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, তখন খারাপ লোকগুলো পৃথিবীতে অবশিষ্ট থাকবে। দ্রুতগামী পাখী এবং জ্ঞানশূন্য হিংস্র প্রাণীর ন্যায় তাদের স্বভাব হবে। তারা কল্যাণকে অকল্যাণ বলে জানবে না এবং অকল্যাণকে অকল্যাণ বলে মনে করবে না। এ সময় শয়তান এক আকৃতিতে তাদের কাছে এসে বলবে, তোমরা কি আহ্বানে সাড়া দিবে না? তারা বলবে, আপনি আমাদেরকে কোন বিষয়ের আদেশ করছেন? তখন সে তাদেরকে মূর্তিপূজার নির্দেশ দিবে। এমতাবস্থায়ও তাদের জীবনোপকরণে প্রশস্ততা থাকবে এবং তারা স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন-যাপন করবে। তখনই শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে। যে এ আওয়াজ শুনবে সে তার ঘাড় একদিকে অবনমিত করবে এবং অন্যদিকে উত্তোলন করবে। এ আওয়াজ সর্বপ্রথম ঐ লোকই শুনতে পাবে, যে তার উটের জন্য হাওদাজ সংস্করণের কাজে নিযুক্ত থাকবে।

আওয়াজ শুনামাত্রই সে অজ্ঞান হয়ে লুটে পড়বে। সাথে সাথে অন্যান্য লোকেরাও অজ্ঞান হয়ে যাবে। অতঃপর মহান আল্লাহ শুক্র ফোটা অথবা ছায়ার ন্যায় বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। বর্ণনাকারী নু'মান (রহঃ) সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এতে মানুষের শরীর পরিবর্ধিত হবে। আবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে। অকস্মাৎ তারা দাঁড়িয়ে তাকাতে থাকবে। অতঃপর আহ্বান করা হবে যে, হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট আস। অতঃপর (ফেরেশতাদের বলা হবে) তাদেরকে থামাও, কারণ তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। তারপর আবারো বলা হবে, জাহান্নামী দল বের কর। জিজ্ঞেস করা হবে, কত জন? উত্তরে বলা হবে, প্রত্যেক হাযার থেকে নয়শ' নিরানব্বই জন। অতঃপর তিনি বললেন, এ-ই তো ঐদিন, যেদিন কিশোরকে পরিণত করবে বৃদ্ধে এবং এ-ই চরম সঙ্কটাপন্ন অবস্থার দিন'।[১৬]

ক্বিয়ামতের মাঠে কবর থেকে প্রথম যিনি উঠবেন :

ক্বিয়ামতের মাঠে রাসূল (ছাঃ) প্রথম ব্যক্তি হিসাবে কবর থেকে উঠবেন। হাদীছে তিনি বলেছেন, أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ، وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ 'ক্বিয়ামতের দিন আমি আদম সন্তানদের নেতা হব এবং আমিই প্রথম ব্যক্তি যার কবর উন্মুক্ত করে দেয়া হবে এবং আমিই প্রথম সুফারিশকারী ও প্রথম সুফারিশ গৃহীত ব্যক্তি'।[১৭]

ক্বিয়ামতের দিন প্রথমে যে উম্মতের বিচার হবে :

ক্বিয়ামতের দিন উম্মতে মুহাম্মাদীর প্রথম বিচার হবে। হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, نَحْنُ آخِرُ الأُمَمِ وَأَوَّلُ مَنْ يُحَاسَبُ يُقَالُ أَيْنَ الأُمَّةُ الأُمِّيَّةُ وَنَبِيُّهَا 'আমরা হলাম সর্বশেষ উম্মত এবং সর্বপ্রথম আমাদের হিসাব গ্রহণ করা হবে। বলা হবে, উম্মী (নিরক্ষর) নবীর উম্মত এবং তাদের নবী কোথায়?[১৮]

জান্নাতে প্রবেশকারী প্রথম জাতি :

হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমাদের আগমন সবার শেষে। কিন্তু আমরা ক্বিয়ামতের দিবসে থাকব সবার প্রথমে। আমরা জান্নাতে প্রবেশকারীদের মধ্যে অগ্রগামী থাকব'।[১৯]

ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ ও মানুষের মাঝে প্রথম বিচার :

আল্লাহ ও মানুষের মাঝে প্রথম বিচার হবে ছালাতের। হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ 'ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দা থেকে ছালাতের হিসাব নেওয়া হবে। ছালাত যথাযথভাবে আদায় হয়ে থাকলে সে সফল হবে ও মুক্তি পাবে। ছালাত যথাযথ আদায় না হয়ে থাকলে সে ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস হবে'।[২০]

ক্বিয়ামতের দিন মানুষের প্রথম বিচার :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِى الدِّمَاءِ 'ক্বিয়ামতের দিন মানুষের মাঝে সর্বপ্রথম বিচার করা হবে হত্যার বিচার'।[২১]

ক্বিয়ামতের দিন বান্দা যে নে'মতের ব্যাপারে প্রথম জিজ্ঞাসিত হবে :

মানুষের সুস্থতা ও পানি দ্বারা পরিতৃপ্ততা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ أَوَّلَ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِى الْعَبْدَ مِنَ النَّعِيمِ أَنْ يُقَالَ لَهُ أَلَمْ

১৬. *মুসলিম হা/২৯৪০; মিশকাত হা/৫৫২০।*

১৭. *মুসলিম হা/২২৭৮; মিশকাত হা/৫৭৪১।*
১৮. *ইবনু মাজাহ হা/৪২৯০।*
১৯. *মুসলিম হা/৮৫৫।*
২০. *নাসাঈ হা/৩৯৯১; ইবনু মাজাহ হা/১৪২৬; মিশকাত হা/১৩৩০।*
২১. *বুখারী হা/৬৮৬৪; মুসলিম হা/১৬৭৪।*

نُصِحَّ لَكَ جِسْمَكَ وَنُرْوِيكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ ‘ক্বিয়ামতের দিন বান্দাকে সবার আগে যে নে‘মত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে তা হ’ল তাকে বলা হবে, আমি কি তোমাকে শরীর সুস্থ রাখিনি? আমি কি ঠান্ডা পানি দিয়ে তোমার তৃষ্ণা নিবারণ করিনি’।[২২]

ক্বিয়ামতের দিন জান্নাতের দরজায় প্রথম কড়া নাড়ানো নবী :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَنَا أَكْثَرُ الأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ ‘ক্বিয়ামতের দিন সমস্ত নবীদের অনুসারীর তুলনায় আমার অনুসারীর সংখ্যা হবে অধিক। আর আমিই সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজায় কড়া নাড়াবো’।[২৩]

প্রথম মাখলুক হিসাবে জাহান্নামের আগুন প্রজ্জ্বলন :

শুফাইয়া আছবাহী (রহঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি একবার মদীনায় উপস্থিত হয়ে দেখলেন এক ব্যক্তিকে ঘিরে লোকেরা সমবেত হয়ে আছে। তিনি বললেন, ইনি কে? লোকেরা বলল, ইনি আবু হুরায়রা (রাঃ) (শুফাইয়া বলেন,) আমি তাঁর কাছে গেলাম এবং তাঁর সামনে গিয়ে বসে পড়লাম। তিনি তখনো লোকদের হাদীছ শুনাচ্ছিলেন। তিনি যখন নিরব এবং একা হলেন আমি তাঁকে বললাম, আমি আপনার কাছে সত্যিকার ভাবেই আপনার নিকট এই আবেদন করছি যে আপনি আমাকে হাদীছ শুনাবেন যা আপনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছ থেকে শুনেছেন, ভালোভাবে বুঝেছেন এবং জেনেছেন।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বললেন, আমি তা করব। আমি অবশ্যই তোমাকে হাদীছ বর্ণনা করব যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বর্ণনা করেছেন এবং আমি যা বুঝেছি ও জেনেছি। এরপর আবু হুরায়রা (রাঃ) কেমন জানি তন্ময়গ্রস্ত হয়ে পড়লেন। আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। এরপর তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসলেন এবং বললেন, অবশ্যই আমি তোমাকে হাদীছ বর্ণনা করব যে হাদীছ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এই ঘরে বর্ণনা করেছিলেন। আমাদের সঙ্গে তখন তিনি এবং আমি ছাড়া আর কেউ সেখানে ছিলনা।

এরপর আবু হুরায়রা (রাঃ) আরো গভীরভাবে তন্ময়গ্রস্থ হয়ে পড়লেন। তারপর তিনি স্বাভাবিকতা ফিরে পেলেন এবং মুখ-মণ্ডল মুছলেন। বললেন, আমি তা করব। অবশ্যই তোমাকে এমন হাদীছ বর্ণনা করব যে হাদীছ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বর্ণনা করেছেন। তিনি এবং আমি এই ঘরে ছিলাম। তিনি এবং আমি ছাড়া সেখানে আমাদের সঙ্গে আর কেউ ছিলনা।

তারপর আবু হুরায়রা (রাঃ) গভীরভাবে তন্ময়গ্রস্ত হয়ে পড়লেন এবং বেহুশ হয়ে উপুড় হয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে দীর্ঘক্ষণ ঠেস দিয়ে রাখলাম। তারপর তাঁর হুশ হল। বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা‘আলা বান্দাদের মাঝে ফায়ছালার জন্য নাযিল হবেন। প্রত্যেক উম্মতই সেদিন থাকবে নতজানু। প্রথম যাদের তলব হবে তারা হ’ল কুরআনের হাফিয, আল্লাহ্র পথে শহীদ এবং প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী এক ব্যক্তি।

এরপর আল্লাহ তা‘আলা কুরআনের পাঠক সেই ব্যক্তিকে বলবেন, আমার উপর যে বিষয় নাযিল করেছিলাম তোমাকে আমি কি সেই বিষয়ের জ্ঞান দেই নাই? সে বলবে, হ্যাঁ, অবশ্যই দিয়েছিলেন, হে আমার রব! আল্লাহ তা‘আলা বলবেন, যে জ্ঞান তুমি লাভ করেছিলে তদানুসারে কি আমল করেছিলে? লোকটি বলবে, আমি তো রাত-দিন এই কুরআন নিয়েই কায়েম থেকেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ, ফিরিশতাগণও বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। পরে আল্লাহ তা‘আলা তাকে বলবেন, তোমার নিয়ত ছিল তোমাকে যেন বলা হয় ‘অমুক ক্বারী’। আর তোমাকে তা বলাও হয়েছে।

এরপর ধনাঢ্য ব্যক্তিটিকে আনা হবে। আল্লাহ তা‘আলা তাকে বলবেন, তোমাকে কি আমি প্রচুর বিত্ত-বৈভব দেইনি? এমনকি কারো প্রতিই তোমাকে মুখাপেক্ষী হিসাবে রাখিনি? লোকটি বলবে, হ্যাঁ, অবশ্যই হে আমার রব! আল্লাহ বলবেন, তোমাকে আমি যা দিয়েছিলাম তা দিয়ে কি আমল করেছ তুমি? লোকটি বলবে, তা দিয়ে আমি আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুণ্ন রেখেছি এবং ছাদাক্বা-খয়রাত করেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ, ফিরিশতাগণও বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। পরে আল্লাহ বলবেন, তোমার ইচ্ছা ছিল তোমাকে যেন বলা হয়, ‘অমুক ব্যক্তি খুব দানশীল’। আর তোমাকে তা বলা হয়েছে।

এরপর আল্লাহ্র পথে নিহত এক ব্যক্তিকে আনা হবে। আল্লাহ তা‘আলা তাকে বলবেন, কিসে তুমি নিহত হয়েছিলে? লোকটি বলবে, আপনি আপনার পথে জিহাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাই আমি লড়াই করলাম। শেষে আপনার পথে নিহত হলাম। আল্লাহ তা‘আলা বলবেন, তোমার কামনা ছিল যে, তোমাকে যেন বলা হয়, ‘অমুক ব্যক্তি বাহাদুর’। আর তা তোমাকে বলা হয়েছে। তারপর নবী (ছাঃ) আমার হাটুতে হাত চাপড়ালেন এবং বললেন, হে আবু হুরায়রা, এই তিনজনই হ’ল আল্লাহর প্রথম মাখলুক যাদের দিয়ে ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হবে’।[২৪]

হাওযে কাওছার থেকে বিতাড়িত প্রথম ব্যক্তি :

عَنْ أَبِي سَلاَّمٍ الْحَبَشِيِّ، قَالَ بَعَثَ إِلَىَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَحُمِلْتُ عَلَى الْبَرِيدِ قَالَ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ شَقَّ عَلَى مَرْكَبِي الْبَرِيدُ فَقَالَ يَا أَبَا سَلاَّمٍ مَا أَرَدْتُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ وَلَكِنْ بَلَغَنِي عَنْكَ حَدِيثٌ تُحَدِّثُهُ عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَوْضِ فَأَحْبَبْتُ أَنْ تُشَافِهَنِي بِهِ . قَالَ أَبُو سَلاَّمٍ حَدَّثَنِي ثَوْبَانُ عَنِ النَّبِيِّ صلى

২২. *তিরমিযী হা/৩৩৫৮; তাবারী ৩০/২৮৮; দাইমুল ক্বাদীর ২/৪৪৩ পৃ.।*
২৩. *মুসলিম হা/১৯৬; ইবনু হিব্বান হা/৬৪৮১; আবু ইয়ালা হা/৩৯৬৪।*
২৪. *তিরমিযী হা/২৩৮২।*

اللهُ عليه وسلم قَالَ حَوْضِي مِنْ عَدَنَ إِلَى عَمَّانَ الْبَلْقَاءِ مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَأَكَاوِيبُهُ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا أَوَّلُ النَّاسِ وُرُودًا عَلَيْهِ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ الشُّعْثُ رُءُوسًا الدُّنْسُ ثِيَابًا الَّذِينَ لاَ يَنْكِحُونَ الْمُتَنَعِّمَاتِ وَلاَ تُفْتَحُ لَهُمُ السُّدَدُ قَالَ عُمَرُ لَكِنِّي نَكَحْتُ الْمُتَنَعِّمَاتِ وَفُتِحَ لِيَ السُّدَدُ وَنَكَحْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمَلِكِ لاَ جَرَمَ أَنِّي لاَ أَغْسِلُ رَأْسِي حَتَّى يَشْعَثَ وَلاَ أَغْسِلُ ثَوْبِي الَّذِي يَلِي جَسَدِي حَتَّى يَتَّسِخَ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . وَأَبُو سَلاَّمٍ الْحَبَشِيُّ اسْمُهُ مَمْطُورٌ وَهُوَ شَامِيٌّ ثِقَةٌ .

আবু সাল্লাম আল-হাবশী (রাহঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, উমার বিন আব্দুল আযীয (রহঃ) এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন আমাকে তার সাথে সাক্ষাতের জন্য নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। সে একটি খচ্চরের পিঠে আমাকে বহন করিয়ে নিয়ে চললো। তারপর তিনি (আবু সাল্লাম) খলীফার দরবারে হাযির হয়ে বললেন, আমীরুল মু'মিনীন! আমাকে এই খচ্চরের পিঠে সওয়ার হয়ে আসতে খুবই কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে।

তিনি বললেন, হে আবু সাল্লাম! আমি আপনাকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে এখানে আনিনি, বরং আমি শুনতে পেলাম, আপনি নাকি হাওযে কাওছার সম্পর্কে ছাওবান (রাঃ)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন? অতএব, আমি পসন্দ করলাম যে, আপনি আমার সামনে তা বর্ণনা করবেন।

আবু সাল্লাম বলেন, ছাওবান (রাঃ) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ইয়ামান দেশের আদান হতে সিরিয়ার হাওযের দৈর্ঘ্য-প্রস্থের পরিমাণ। এর পানির রং দুধের চেয়ে সাদা, মধুর চেয়ে মিষ্টি এবং পানপাত্রের সংখ্যা হবে আকাশের তারকার সমসংখ্যক। যে ব্যক্তি তা হ'তে এক ঢোক পানি পান করবে, সে আর কখনো পিপাসার্ত হবে না। সর্বপ্রথম এর পানি পানের সৌভাগ্য অর্জন করবে দরিদ্র মুহাজিরগণ, যাদের মাথার চুল এলোমেলো, পোশাক ধূলিমলিন, যারা ধনীর দুলালীদের বিয়ে করেননি এবং যাদের জন্য বন্ধ দরজা খোলা হ'ত না।

উমর (রাঃ) বলেন, কিন্তু আমি তো সুখ-স্বাচ্ছন্দে লালিতা-পালিতাকে বিয়ে করেছি, আমার জন্য বন্ধ দরজা খোলা হয়, আমি খলীফা আব্দুল মালিকের আদরের দুলালী ফাতিমাকে বিয়ে করেছি। আমার মাথার চুল ধূলিমলিন হওয়ার আগ পর্যন্ত তা ধুবো না এবং আমার পরনের জামা ময়লাযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ধুবো না'।[২৫]

পুলছিরাত প্রথম যারা পার হবে এবং জান্নাতে তাদের প্রথম খাদ্য ও পানীয় :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম ছাওবান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে দাঁড়িয়েছিলাম। ইতোমধ্যেই ইয়াহুদীদের এক আলেম এসে বলল, আস-সালামু আলাইকা হে মুহাম্মাদ! এরপর আমি তাকে এমন এক ধাক্কা মারলাম যে, সে প্রায় পড়ে যাওয়ার উপক্রম হ'ল! সে বলল, তুমি আমাকে ধাক্কা মারলে কেন? আমি বললাম, তুমি 'হে আল্লাহ্র রাসূল'! বলতে পার না? ইয়াহুদী বলল, আমরা তাকে তার পরিবার-পরিজন যে নাম রেখেছে সে নামেই ডাকি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমার নাম 'মুহাম্মাদ'। আমার পরিবারের লোকই আমার এ নাম রেখেছে। এরপর ইয়াহুদী বলল, আমি আপনাকে (কয়েকটি কথা) জিজ্ঞেস করতে এসেছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, তোমার কী লাভ হবে, যদি আমি তোমাকে কিছু বলি? সে বলল, আমি আমার কান পেতে শুনব।

এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার কাছে যে খড়িটি ছিল তা দিয়ে মাটিতে আঁকাঝোকা দাগ কাটছিলেন। তারপর বললেন, জিজ্ঞেস কর। ইয়াহুদী বলল, যেদিন এ যমীন ও আকাশমণ্ডলী পাল্টে গিয়ে অন্য যমীন ও আকাশমণ্ডলীতে পরিণত হবে (অর্থাৎ ক্বিয়ামত হবে) সেদিন লোকজন কোথায় থাকবে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তারা সেদিন পুলছিরাতের কাছে অন্ধকারে থাকবে। সে বলল, কে সর্বপ্রথম (তা পার হবার) অনুমতি লাভ করবে? তিনি বললেন, দরিদ্র মুহাজিরগণ!

ইয়াহুদী বলল, জান্নাতে যখন তারা প্রবেশ করবে তখন তাদের তোহফা কি হবে? তিনি বললেন, মাছের কলিজার টুকরা। সে বলল, এরপর তাদের দুপুরের খাদ্য কি হবে? তিনি বললেন, তাদের জন্য জান্নাতের ষাঁড় যবেহ করা হবে, যা জান্নাতের আশেপাশে চরে বেড়ায়। সে বলল, এরপরে তাদের পানীয় কি হবে? তিনি বললেন, সেখানকার একটি ঝর্ণার পানি যার নাম 'সালসাবীল'। সে বলল, আপনি ঠিক বলেছেন'।[২৬]

উপসংহার :

মহান আল্লাহ্র সৃষ্টিকৌশল বড়ই বৈচিত্র্যময় ও চমকপ্রদ। মানব ইতিহাসে এ নশ্বর দুনিয়ায় সবকিছুরই প্রথম ও শেষ নামক দু'টি অস্তিত্ব বিদ্যমান। ভালমন্দের বাক্য বিধানে প্রথম চালুকৃত বিষয় যদি হয় কল্যাণকর তাহ'লে সেটা শেষ অবধি মানবতার কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসুক এবং তা অশেষ নেকী হাসিলের মাধ্যম হৌক। পক্ষান্তরে যদি সেটা অকল্যাণকর হয় তাহ'লে শেষ অবধি এর পাপের ভার থেকে মানবতা মুক্তি পাক। প্রকৃতার্থে অবিনশ্বর মহান আল্লাহই প্রথম এবং তিনিই শেষ। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আমাদের সকলকেই সর্বদা নেকীর কাজে অগ্রগামিতা লাভের তাওফীক দান করুন-আমীন!

[লেখক : পিয়ারপুর, ধুরইল, মোহনপুর, রাজশাহী]

---

২৫. তিরমিযী হা/২৪৪৪; ইবনু মাজাহ হা/৪৩০৩।

২৬. মুসলিম হা/৩১৫।

মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (খুলনা)

*[আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও খুলনা যেলার সম্মানিত সভাপতি **মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম** (৫৪)। তিনি ছিলেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর সূচনালগ্নের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। সেসময়ের প্রতিটি জাগরণীর শুরুতে তাঁর গুরুগম্ভীর আর দরাজ কণ্ঠের ডায়ালগ মানুষের হৃদয়ে অপূর্ব জাগরণ সৃষ্টি করেছিল। সেই সংগ্রামী মানুষটি জীবনের শুরুকাল থেকেই একজন স্বচ্ছ বুদ্ধিসম্পন্ন, শুদ্ধভাষী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি খুলনা যেলার রুপসা থানার চাঁদপুর দাখিল মাদ্রাসার সুপার হিসাবে থাকার পাশাপাশি বাংলার আনাচে-কানাচে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক সমাজ গঠনের দাওয়াতী কাজ করে যাচ্ছেন। তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের মনিকোঠায় তাঁর একনিষ্ঠ দাওয়াত যথেষ্ঠ গ্রহণযোগ্যতাও পেয়েছে। তাঁর ঘটনাবহুল জীবন সম্পর্কে জানার জন্য সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন তাওহীদের ডাক-এর নির্বাহী সম্পাদক **ড. মুখতারুল ইসলাম**। সাক্ষাৎকারটি তাওহীদের ডাক পাঠকদের খেদমতে পেশ করা হ'ল]*

তাওহীদের ডাক : আপনার জন্ম ও বেড়ে উঠা সম্পর্কে জানতে চাই।

মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম : আলহামদুলিল্লাহ আমার জন্ম ১৯৬৭ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী বর্তমান সাতক্ষীরা যেলার অন্তর্গত আশাশুনি থানার কুচুয়া গ্রামে নানার বাড়ীতে। সেই সময় সাতক্ষীরা আলাদাভাবে কোন যেলা ছিল না। বৃহত্তর খুলনার একটি মহকুমা ছিল।

তাওহীদের ডাক : আপনার পিতা-মাতা, ভাই-বোনদের সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন।

মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম : আমার আব্বার নাম মকবুল হোসেন মালি আর মার নাম জরিনা বেগম। আমাদের গোষ্ঠীগত পদবী হচ্ছে মালি। আব্বা মারা গেছেন ২০০৯ সালের ৩১শে জুলাই শুক্রবার। আলহামদুলিল্লাহ আম্মা এখনও বেঁচে আছেন। আর আমরা চার ভাই ও দুই বোন। আমি সবার বড়।

তাওহীদের ডাক : আপনার প্রাথমিক পড়াশোনা কোথায় শুরু হয়?

মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম : আমার পড়াশোনার হাতেখড়ি হয়েছিল সাতক্ষীরা যেলার আশাশুনি থানার কুচুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। প্রাইমারী থেকে যখন আমি হাই স্কুলে ভর্তি হলাম তখন আমার অপুত্রক নানা আশাশুনির 'গুনাগারকাটি খাইরিয়া আযীযিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা'য় ভর্তি করিয়ে দেন। এভাবে আমার মাদ্রাসার লেখাপড়া শুরু হয়েছিল। মূলতঃ আমি নানা-নানীর সাথেই থাকতাম। তাদের পুত্র সন্তান না থাকার কারণে আমাকেই পুত্রের মত লালন-পালন করতেন। আমার অন্যান্য ভাই-বোন পার্শ্ববর্তী গ্রামে আব্বা-আম্মার সাথেই থাকত।

আমি গুনাগারকাটি খাইরিয়া আযীযিয়া সিনিয়র মাদ্রাসায় দাখিল অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করি। তারপর সাতক্ষীরা যেলার কলারোয়া থানার অন্তর্গত কাকডাঙ্গা সিনিয়র মাদ্রাসায় ভর্তি হই। মাদ্রাসাটির প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের শ্রদ্ধেয় পিতা মাওলানা আহমাদ আলী। কাকডাঙ্গা মাদ্রাসায় পড়াকালীন সময় যুবসংঘের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. এ এস এম আযীযুল্লাহদের বাড়িতে লজিং থাকতাম। ওরা ছিল তিন ভাই, তিন বোন। তার বড় ভাই আমার সম ক্লাসেই স্কুলে পড়ত। আযীযুল্লাহ ও তার মেঝ ভাইকে আমি আরবী শিখাতাম। ওর মাকে আমি মা বলতাম। তিনি আমাকে এতটাই স্নেহ-ভালোবাসা দিতেন যে বাইরে থেকে কেউ গেলে বুঝতে পারত না এই ভদ্রমহিলার তিনটা ছেলে না চারটা। মাতৃস্নেহে তারাও যেমন লালিত-পালিত হয়েছে আমিও তেমন মায়ের আদর পেয়েছি। সেই মাকে যেন মহান আল্লাহ জান্নাতবাসী করেন।-আমীন!

তারপর আমি কাকডাঙ্গা মাদ্রাসা থেকে ১৯৮৩ সালে দাখিল, ১৯৮৫ সালে আলিম এবং ১৯৮৭ সালে ফাযিল পাশ করেছি। তারপর কামিল পড়তে যশোর যেলার কেশবপুর উপযেলার বাহারুল উলুম কামিল মাদ্রাসায় গেলাম। ১৯৮৯ সালে সেখানে আমি হাদীছের উপর কামিল ডিগ্রি কৃতিত্বের সাথে অর্জন করি। এরপরে আমি সাতক্ষীরা সরকারী কলেজে থেকে ডিগ্রি পাশ করে মাস্টার্সের জন্য এডমিশন নিয়েছিলাম। আদম্য স্পৃহা থাকা সত্ত্বেও পারিবারিক বিপর্যয়ের মুখে আমি আর ওটা চালিয়ে যেতে পারিনি।

তাওহীদের ডাক : কখন আপনার কর্মজীবন শুরু হয়?

মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম : ১৯৯০ সালের ১৩ই মার্চ বাগেরহাট যেলার মোড়েলগঞ্জ থানার সোনাখালি আযীযিয়া সিনিয়র মাদ্রাসায় আরবী প্রভাষক হিসাবে যোগদান করি। ওটা আলিম মাদ্রাসা ছিল। সেখানে প্রায় আট বছর চাকুরীর পর ১লা জানুয়ারী ১৯৯৮ সালে খুলনা যেলার রূপসা থানার চাঁদপুর দাখিল মাদ্রাসার সুপার হিসাবে যোগদান করি। বিগত ২৪ বছর যাবত আমি সেখানেই দায়িত্বরত আছি।

তাওহীদের ডাক : আপনার বিবাহ ও পরিবার সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি।

মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম : বৈবাহিক জীবন শুরু হয়েছিল ১৯৮৫ সালে। সবেমাত্র আলিম পাশ করেছি। হঠাৎ শুনলাম, আমার বিয়ে। আমার অপুত্রক নানা-নানী। তাদের পুত্রতুল্য

নাতীর নাত বৌ দেখবে। আমার বিয়ের অফারটি এসেছিল গ্রামেরই এক ধনী, বুনিয়াদী ও শিক্ষিত পরিবার থেকে। আমার শ্বশুর আ. ক. ম. আলাউল হক কাদাকাটিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক ছিলেন। দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করে তিনি এখন অবসরে গেছেন। তিনি এখনও বেঁচে আছেন, তবে অসুস্থ। মুহতারাম আমীরে জামা'আতের দুই/তিনটা বোনের বিয়ে হয়েছে ঐ বংশে। সেই সুবাদে আমার শ্বশুর আমীরে জাআ'আতকে মামা সম্বোধন করেন। আমার বিয়ের প্রস্তাব যখন এরকম একটা ফ্যামিলি থেকে আসলো, তখন তা প্রত্যাখ্যান করাটা সমীচিন মনে হ'ল না। যে কারণে ১৯৮৫ সালের ২৭শে নভেম্বর ছাত্রজীবনেই বিয়েটা হয়ে গেল। যদিও খুবই দুঃখজনক হ'ল, আমি তখন কামিল পাশ করে কেবল কর্মজীবনে যোগদান করি। চাকরি হ'ল কিন্তু বেতন হওয়ার আগেই আমার সন্তানসম্ভবা স্ত্রী একলাম্পশিয়া হয়ে ১৯৯০ সালের ৮ই এপ্রিল ইন্তেকাল করে *(ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)*। আল্লাহ তাকে মাগফেরাত নসীব করুন।-আমীন!

এটা আমার জীবনের খুব সাংঘাতিক মোড় বদলকারী ঘটনা ছিল। এরপরে ১৯৯০ সালের ১৫ই ডিসেম্বর বাগেরহাট যেলার মোড়েলগঞ্জ থানার সোনাখালি গ্রামের শেখ ইয়াকুব আলীর দ্বিতীয়া কন্যা রহিমা খাতুনকে বিয়ে করেছি। আলহামদুলিল্লাহ, এই পক্ষে আমার দুই ছেলে এবং একটি মাত্র মেয়ে আছে। বড় ছেলেটা কামিল পরিক্ষার্থী। করোনার কারণে আটকে আছে। পরীক্ষা হলে কামিল উত্তীর্ণ হবে ইনশাআল্লাহ। দ্বিতীয় ছেলেটা এবার খুলনা বিএল কলেজ থেকে সাইন্স নিয়ে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়েছে। সে খুলনা যেলা স্কুল থেকে এসএসসিতে জিপিএ ফাইভ পেয়েছিল। বড় মেয়েটা খুলনা নৌবাহিনী স্কুল এ্যাণ্ড কলেজের ২য় বর্ষের ছাত্রী। সেও জিপিএ ফাইভ পেয়ে এসএসসি পাশ করেছিল।

১৯৯৬ সালের ১২ই ডিসেম্বর আমি আরেকটি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই। সেখানে আমার একটি ছেলে ও দু'টি মেয়ে আছে। ছেলেটা অটিস্টিক। বয়স ২২ ছাড়িয়ে গেছে। ছেলেটাকে লালন-পালন করা যথেষ্ট কঠিন কাজ তার মায়ের জন্যে এবং আমার জন্যও। তার সমসাময়িক অনেক অটিস্টিক সন্তানগুলো পরপারে চলে গেছে। আলহামদুলিল্লাহ! সে এখনও বেঁচে আছে। এই পক্ষের বড় মেয়েটা এবার চতুর্থ শ্রেণীতে ও সর্বকনিষ্ঠা মেয়েটা প্লে গ্রুপে। এদের নিয়েই আমার পারিবারিক জীবন।

তাওহীদের ডাক : আপনার আহলেহাদীছ হওয়ার সূত্রপাতটা কিভাবে হয়েছিল?

মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম : আমার নানা জন্মসূত্রে আহলেহাদীছ ছিলেন আর আমাদের পূর্বপুরুষ হানাফী মাযহাবের অনুসারী। সেই হিসাবে আমিও হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলাম। তবে নানার বাড়িতে থেকে নানার কিছুটা কালচার অনুসরণ করে আহলেহাদীছ মসজিদে যাতায়াত করতাম। এভাবে আহলেহাদীছের আক্বীদা-মানহাজ আমার ভিতরে দানা বাঁধতে শুরু করেছিল। কিন্তু নানা যখন আমাকে একটা পীর ছাহেবের মাদরাসায় ভর্তি করে দিলেন তখন আমি তালেবুল ইলম হয়ে গেলাম। ওস্তাদজীদের সংস্পর্শে থেকে তাদের মত ছালাত-ছিয়াম পড়তে আরম্ভ করলাম। জোর কদমে পীর ছাহেবদের মিলাদ অনুষ্ঠানে শরীক হ'তে লাগলাম। তখন আমার ভিতরে বিলুপ্তপ্রায় হানাফী মাযহাব মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। লোকজন যখন বলাবলি করত তুমি লা-মাযহাবী হয়ে গেছ। তখন সাংঘাতিকভাবে আমার ভিতরে একটা বিদ্রোহ জাগ্রত হয়। সর্বনাশ! আমরা তো বড় মাযহাবের লোক ছিলাম। এই কালচারটি তো আসলে আমাদের নয়।

একদিন জুম'আর ছালাত আদায়ের জন্য মসজিদে যাওয়ার সময় নানাকে বললাম, তোমাদের মসজিদে তুমি যাও, আমাদের মসজিদে আমি যাচ্ছি। নানা বলল, কেন, কি হয়েছে? আমি বললাম, না তোমরা লা-মাযহাবী, তোমাদের পিছনে আমাদের ছালাত হয় না। নানা বলল, তাই! কার কাছে শুনেছ? বললাম, ওস্তাদজীদের কাছ থেকে শুনেছি? নানা বললেন, হ্যাঁ এরকম একটি ফৎওয়া আছে! তবে তার নিচে আরো একটি ফৎওয়া আছে যে, যাদের ভাত খাওয়া যায়, তাদের পিছনে ছালাত হয়। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে নানা আমাকে তার ভাত খাওয়ার খোটা দিচ্ছেন।

পরে আমাদের নিজস্ব বাড়িতে যেয়ে আব্বা-আম্মাকে বললাম, আমি আর নানাবাড়ী থাকব না, চলে আসব। কারণ আমার হানাফীয়াত হচ্ছে শক্ত ও মূল্যবান জিনিস। এটা নানার সংস্পর্শে থেকে আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। আব্বা বলল, না এটা হবে না আমি তোমার জন্মের পর পরই তোমাকে উনাদের কাছে দিয়ে দিয়েছি। তাদের ছেলে সন্তান নেই। তোমাকে ওখানেই থাকতে হবে। আব্বা আবার আমাকে সাথে নিয়ে নানাবাড়ি রেখে আসলেন। কিন্তু আমি তখন চরমভাবে হোঁচট খেতে লাগলাম। মাদ্রাসায় বড় ভাইয়েরা আমাকে লা-মাযহাবী, ওহাবী বলে কটাক্ষ করত। কারণ আমি নানাবাড়িতে থাকতাম। আর আমার নানা আহলেহাদীছ সমাজের একজন সম্মানিত মানুষ ছিলেন। সকলেই তাকে মূল্যায়ন করত। তিনি তাহাজ্জুদের ছালাত কখনো মিস করতেন না। আমি শুয়ে থেকে দেখতাম নানা রাতে উঠে ছালাত পড়ছেন, দো'আ করছেন, কান্নাকাটি করছেন। তখন তাকে খুবই কামিল লোক মনে হত।

তাওহীদের ডাক : আপনার নানা কি আলেম ছিলেন? আর আপনার অবস্থা শেষ পর্যন্ত কিভাবে শুধরিয়ে নিলেন?

মাওলান জাহাঙ্গীর আলম: আমার নানার নাম মুন্সি ফজর আলী সানা। তিনি আলেম ছিলেন না। নানা লা-মাযহাবী, এইটা আমার কাছে খুবই খারাপ লাগত। নানার কাপড়ে প্যাঁচানো কিছু বইয়ের পুটলি ছিল। উনি কিসের ভিত্তিতে এসব করতেন তা খুঁজতে শুরু করলাম। পুটলি হাতড়িয়ে আমি দেখি যে ছোট ছোট বই। আমীন সমস্যার সমাধান,

সূরা ফাতিহা পড়ার সমাধান, রাফউল ইয়াদাঈন সমস্যার সমাধান প্রভৃতি নামের ছোট ছোট বই। নিচে লেখকের নাম লেখা আহকার আহমাদ আলী। আহকার মানে তখনও বুঝতাম না। পরবর্তীতে জানতে পারলাম মুহতারাম আমীরে জামা'আতের আব্বাজান এত বড় স্বনামধন্য আলেম ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা হওয়া সত্ত্বেও নামের আগে আহকার ব্যবহার করতেন। তিনি যে একজন দ্বীনের খাদেম এটাই প্রকাশ করতে বেশী ভালোবাসতেন। আমি সেই বইগুলো পড়তে শুরু করলাম। যুক্তিভিত্তিক দলীলগুলো আমার খুবই ভালো লাগত। ছোটবেলা থেকে আমি নিরপেক্ষতাসম্পন্ন মানুষ ছিলাম। নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে কোন কাজ হলে সেটি বুঝতে পারতাম। মেধাবী ছাত্র হিসাবে শিক্ষকদের কাছে ভালো সমাদৃত হতাম। প্রাইমারী স্কুলে আজীবন আমি প্রথমস্থান অর্জন করেছি। মাদ্রাসায় ভর্তি পরীক্ষায় আমি প্রথমস্থান অর্জন করেছিলাম। দাখিলে বৃত্তিসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলাম। মোটামুটি ছাত্র হিসাবে খারাপ ছিলাম না। এরপর সেই বইগুলা পড়ে আমার ভালো লাগতে লাগল। যুক্তিপূর্ণ মনে হ'ত। তবুও আমি মিলাদ শিখতাম। মিলাদে যে বয়ান দেওয়া হয় এবং মিলাদের যে দরূদ, আল্লাহুম্মা ছল্লি আলা সাইয়েদিনা....ইত্যাদি রপ্ত করতাম। কারণ এগুলো পড়লে সকলেই আদর-আপ্যায়ন করত।

পাশাপাশি নানার সেই বইগুলা পড়ে সেই কথাগুলো যে একেবারে ফেলনা নয় এটাও মনে হত। এইরকম একটা দোদুল্যমান পরিস্থিতিতে চলছিলাম। নানা আমাকে বলত, নানা ভাই! 'তুমি লেখাপড়া করে তোমার যেটা ভালো লাগে তুমি সেটা করো। তোমাকে এটাই করতে হবে, আমি সেটা বলছি না। তুমি কুরআন হাদীছ পড়ে যেটা সঠিক মনে করবে, সেটা করবে'।

আমাকে নিয়ে ক্লাসের বন্ধু মহল টুকিটাকি কথা বলে। একদিন ক্লাসে এক ওস্তাদকে বললাম, আমার নানা যল্লীন বলে আর আমরা দ্বল্লীন বলি। যদ হবে, না দ্বদ হবে? ওস্তাদজী তখন বললেন, ওটা আরবীতে দ্বদ হবে আর উর্দূতে এসে যদ হবে। আমি আবার উস্তাদজীকে বললাম, মনে করেন, আপনার নাম তো ওমুক (উস্তাদজীর নামটা বললাম)। মাদ্রাসায় আপনার এই নাম আর বাড়িতে গেলে কি আপনার নামটা পরিবর্তন হয়ে যাবে। স্থান পরিবর্তন হওয়ায় যদি নাম পরিবর্তন না হয় তাহ'লে আরবী বর্ণমালার উচ্চারণ উর্দূতে পরিবর্তন হয় কিভাবে?

আর যদি পরিবর্তন হয় তাহ'লে আপনারাও তো লা-মাযহাবী। কারণ আপনারা 'ওযূ' করে আসি বলেন, রামাযান মাস বলেন, আবার পীর ছাহেবের গোরস্থানে গেলে 'রওযা মোবারকে যাচ্ছি বলেন। তখন উস্তাদজী গম্ভীর স্বরে বললেন, 'এই! বেত নিয়ে আই তো'। একজন ছুটে বেত আনতে গেল। আমি তখন মনে মনে বললাম, জীবনে কখনও বেত্রাঘাত খাই নাই, এবার বুঝি আমার নিস্তার নাই। আমি তখন ভয়ে ভয়ে বললাম, উস্তাদজী! না বুঝে বলেছি, আর এরকম বলবো না। উস্তাদজীর কাছে মাফ চেয়ে হাফ ছেড়ে বাঁচলাম।

এসব পারিপার্শ্বিকতা আমার মনে দারুন ধাক্কা দিল। আমি বিভিন্ন বই পড়া শুরু করলাম। আমীরে জামা'আতের কথা শুনতাম আর তার বই পড়তে লাগলাম। গল্প শুনতাম মাওলানা আহমাদ আলীর ছেলে আসাদুল্লাহ আল-গালিব বোর্ড স্ট্যান্ড করেছে। পরবর্তীতে স্যারের বইগুলো পড়াশোনার মাধ্যমে আহলেহাদীছ সম্পর্কে আরো বিশদভাবে জানতে পারলাম। এভাবেই আমি জেনেশুনে পুরোপুরি আহলেহাদীছ হয়ে গেলাম আলহামদুলিল্লাহ। আর আমার নানাজান আলেম না হলেও তার বইসমূহ থেকে ইলমের স্বাদ আস্বাদন করেছিলাম।

তাওহীদের ডাক : আপনার সাংগঠনিক জীবন কিভাবে শুরু হয়েছিল? মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সাথে আপনার সরাসরি সাক্ষাৎ কোন সময় হয়েছিল, মনে পড়ে কি?

মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম : কাকডাঙ্গা মাদ্রাসার একজন শিক্ষক ছিলেন মাওলানা মুহীউদ্দীন। তখন সংগঠন বলতে 'ছাত্র শিবির' এবং আদি সংগঠন জমঈয়তের 'তালাবায়ে আরাবিয়া' ছাত্রদের মাঝে কাজ করত। আমি শিবির সংগঠনের দিকে ঝুঁকে গিয়েছিলাম। এটা দেখে মুহীউদ্দীন উস্তাদজী বললেন, যে ওখানে যাওয়ার দরকার নেই। আমাদের একটা সংগঠন আছে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'। ১৯৮২ সালের দিকে হুজুর আমাদের কয়েকজনকে ট্রেন যোগে রাজশাহীতে নিয়ে আসলেন। আমি রাণীবাজারে মুহতারাম আমীরে জামা'আতকে দেখলাম উনি চেয়ারে বসা ছিলেন। উনি আমাদের সাক্ষাৎকার নিলেন। স্যারের সাথে কথা বলে খুবই ভালো লাগলো। তিনি আমাকে বললেন, 'কাজ করা লাগবে'। তাঁর বইগুলো পড়া শুরু করলাম। এরপরই বিশদভাবেই জানতে পারলাম যে, আহলেহাদীছদের সব আমলই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত আর হানাফীদের অনেকটাই কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সাথে মিলে না।

পরবর্তীতে আমীরে জামা'আত কাকডাঙ্গা মাদ্রাসায় গিয়েছিলেন। তখন মাদ্রাসায় 'যুবসংঘে'র শাখা গঠন করে আমাকে সভাপতির দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এইখান থেকেই আমার সাংগঠনিক জীবন শুরু হয়।

আমি দীর্ঘ সময় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল ছিলাম এবং পরবর্তীতে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর দায়িত্বশীল হিসাবে আসলাম। ইস্রাফিল ভাইয়ের মৃত্যুর পর থেকে অদ্যবধি আমি খুলনা যেলার সভাপতির দায়িত্ব পালন করে আসছি।

তাওহীদের ডাক : আপনি সুমিষ্ট গায়ক, বলিষ্ট উপস্থাপক। সেই জায়গা থেকে 'আল-হেরা' শিল্পীগোষ্ঠী সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন।

মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম : আমি কামিল পাশ করে আরবী প্রভাষক হিসাবে এক মাদ্রাসায় সবেমাত্র যোগদান করেছি। ঐ সময় শিল্পীদের নিয়ে সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি অডিশনের

ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে আমি, মরহুম শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট), আব্দুল মান্নান (সাতক্ষীরা), নিযামুদ্দীন (কুষ্টিয়া) সহ প্রমুখ শিল্পীদের দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। আমি সেখানে গেয়েছিলাম,

'অনাদি, অনন্ত, হে মা'বূদ সুবহান
দ্বীনহীন এ বান্দারে কর রহমদান'।

যাইহোক ১৯৯১ সালের ২৫ ও ২৬শে এপ্রিল রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াতে অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর ২য় জাতীয় সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমার পরপরই মুহতারাম আমীরে জামা'আত ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্যারের প্রস্তাবক্রমে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদের যৌথ বৈঠকের পরামর্শ অনুযায়ী জয়পুরহাটের নবাগত তরুণ শিল্পী শফীউল আলম (পরবর্তী নাম 'শফীকুল ইসলাম')-এর নেতৃত্বে আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠীর পদযাত্রা শুরু হয়।

আর উপস্থাপনার ব্যাপারটি শুরু হয়েছিল কাকতালীয়ভাবে। প্রথমদিকে আমরা বিভিন্ন কবিতাকে সুর দিয়ে জাগরণী বানাতাম। এভাবে একবার এক সপ্তাহব্যাপী মারকাযের পূর্ব পার্শ্বস্থ মসজিদে ভালো লাগা কবিতাগুলো বাণীবদ্ধ করার জন্য আমাদের রিহার্সেল চলছিল। শফীকুল ইসলাম ভাই গাইছেন,

'দ্বার খুলে দে দ্বার খুলি
আহলেহাদীছ আন্দোলনে ধন্য আজি এই ধরণি'

হঠাৎ আমার মাথায় আসল যে, একটু ভিন্ন কিছু যোগ করা যায় কি না? আমি সবাইকে বললাম, আমি দরজায় ঠক ঠক করে শব্দে করে বলবো,

'দ্বার খুলে দাও! আহলেহাদীছ আন্দোলনের বিজয় পতাকা উড্ডীন হয়েছে, এ বাতাস বইছে বাংলার আকাশে বাতাসে, ঘরে ঘরে, দ্বার খুলে দাও!

এভাবে ভয়েস দেওয়ার পরেই শফীকুল ইসলাম ভাই গাইতে শুরু করবে। তখনই শফীকুল ইসলাম বলে উঠেলন, হ্যাঁ, ঠিক ঠিক। এটা কোন পরামর্শ, পরিকল্পনা ছাড়াই কল্পনাতীতভাবেই শুরু হয়েছিল। তারপর আমরা টেপ-রেকর্ড করে আমীরে জামা'আতের কাছে নিয়ে গেলে তিনি শুনে বললেন, সব জাগরণীগুলো এভাবেই করো। আমি তখন থেকে জাগরণী পড়ে ডায়লগটা নিজে লিখতাম। তারপর আমি আমীরে জামা'আতের কাছে সংশোধন করে নিয়ে বলতাম। আলহামদুলিল্লাহ! এভাবেই আমাদের জাগরণীগুলো অসাধারণ হয়ে গেল। এভাবে উপস্থাপনার জগতে আসা।

তাওহীদের ডাক : আপনি একজন সুবক্তা। আপনার প্রথমদিন স্টেজের বক্তব্যের কথা মনে পড়ে কি?

মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম : মাদ্রাসায় ছাত্র থাকাকালীন সময় স্টেজে ইসলামী গযল, হামদ, নাত, জাগরণী এবং বক্তৃতা দেওয়ার অভ্যাস গড়ে উঠেছিল। প্রতিষ্ঠানে বাংলা বক্তৃতায় আমি বরাবরই প্রথমস্থান অধিকার করতাম। বিতর্ক প্রতিযোগিতায় আমি যে পক্ষে অবস্থান নিতাম, সবার কাছে মনে হত যে বিজয়ের পাল্লাটা আমার দিকেই গড়াবে। তাদের ভালোবাসা আর সমর্থনটা আমাকে অনুপ্রাণিত করত।

আমি নবম-দশম শ্রেণীতে থাকাকালীন সময় বিভিন্ন ওয়ায মাহফিলে যেতাম। তখন আহলেহাদীছদের মধ্যে দেশ বরেণ্য ওয়ায়েযীন ছিলেন মাওলানা আব্দুল্লাহ ইবনে ফযল, আব্দুল্লাহ বিন কাযেম, আবু তাহের বর্ধমানী, আব্দুর নূর সালাফী প্রমুখ। আমি এসকল বক্তাদের হুবহু স্বর আর ঢং-এ বক্তব্য দিতে পারতাম। আমি তাদের সুরে বক্তৃতা দিলে আড়াল থেকে কেউ বুঝতে পারতো না। আমীরে জামা'আতের সাথে কোন সফরে থাকলে আমার কাছ থেকে তিনি এসব দেশ বরেণ্য আলেমের বক্তব্য শুনতে চাইতেন। আমি হুবহু তাদের কণ্ঠ নকল করে তাকে শুনাতাম। এতে উপস্থিত সবাই অনেক মজা পেতেন।

একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকেই বক্তৃতায় বেশ পারঙ্গম ছিলাম। একটি স্মৃতি না বললেই নয়। ১৯৭৮ সালের দিকে আমাদের গ্রামে মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছিল। তখন মক্তবের উস্তাদজী আমাদের ৮জন ছাত্রকে বললেন, তোমাদের ওয়াজ করতে হবে। ওয়াজ করতে হবে শুনে সবাই আঁতকে উঠল। আর ওদের আতঙ্কটা আমি বেশি করে তুলে ধরলাম। আমি চালাকি করে বন্ধুদের সাথে গল্প করলাম যে, অমুক জায়গায় ওয়ায করতে গিয়ে একজন দড়াম করে পড়ে গেছে, অমুক জায়গায় আরেকজন খুতবা দিতে গিয়ে হঠাৎ করে মেম্বার থেকে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে।

এদিকে আমি উস্তাদজীকে বললাম, আমি তেমন কিছু পারি না। আপনি যদি আমাকে সবার শেষে বলতে দেন তাহলে ওরা যা বলবে তা শুনে হয়তো দু-চার কথা বলতে পারতাম।

মাহফিলের আগেই অন্য এক মক্তবের উস্তাদজীর কাছ থেকে তা'লীম নিয়ে বক্তব্যের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে স্টেজে বসে আছি। মাহফিলের দিন সহপাঠীরা বক্তব্য দেওয়ার ভয়ে তারা পালিয়ে বিভিন্ন কাজে নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখল। মঞ্চে তাদের নাম ডাকলে কাউকেই খুঁজে পাওয়া গেল না। এমতাবস্থায় আমার নাম ঘোষণা হ'ল। আমি উঠে গিয়ে বক্তব্য পেশ করলাম। যখন আমি বক্তব্য শুরু করি তখন বন্ধুরা সব ছুটে আসল। তারপর আধা ঘন্টা পার হয়ে গেল। আমাদের গ্রামের হাজী ছাহেব আলহাজ্জ মুছলেহুদ্দীন উক্ত মাহফিলের সভাপতি আমার বক্তব্য শুনে মুগ্ধ হয়ে আমাকে পাঁচ টাকা উপহার দিয়েছিলেন। সেই সময় পাঁচ টাকার অনেক দাম। সহপাঠীরা আমার উপর ক্ষেপে গিয়ে তারা বলল, আমাদের ভাগিয়ে বক্তব্য দেওয়া হচ্ছে। আমি তাদের বললাম, আমি ওয়ায করতে পারি না। আমি তো ওখানে আছি আর আমাকে ধরে ফেলেছে, আমি আগে থেকে পালাতে পারি নাই। যেই নাম ডেকেছে সেই আমি দাঁড়িয়ে ভয়ে কি বলতে, কি বলে ফেলেছি তা আমি জানি না। তাদের বিশ্বাস না হওয়ায় আমি

তাদেরকে বললাম, দেখ! ইসলামী শরী'আতে এমন প্রতিযোগিতা জায়েয আছে। আমার লাইফে ঐ প্রথম মঞ্চের ওয়ায ছিল।

তাওহীদের ডাক : আপনি বাংলা সাহিত্যের ছাত্র না হয়েও বিশুদ্ধ ভাষা চয়ন করে কথা বলেন। কিভাবে সম্ভব হয়? এর পেছনে বিশেষ কোন অনুপ্রেরণা আছে কী?

মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম : আমার দীর্ঘদিনের সহপাঠী ঢাবির আইআর (ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনশিপ)-এর ছাত্র ও বর্তমান বাঁকাল মাদ্রাসার খণ্ডকালীন ইংরেজী শিক্ষক, একজন নিবিড় সমাজ সংস্কারক কাওছার আলী আর আমি ছাত্রাবস্থায় মরহুম মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁর 'মোস্তফা চরিত', গোলাম মোস্তফার 'বিশ্বনবী', আব্দুর রহীম ছাহেবের 'সুন্নাহ ও বিদ'আত' প্রভৃতি বইগুলো কিনতাম ও পড়তাম। আর আমরা পরস্পরে উচ্চাঙ্গের ভাষা ব্যবহার করে চিঠি লিখতাম। কে কতটা ভাষার লালিত্ব, ছন্দের মাধুর্য, ব্যকরণের চাতুর্য করতে পারে সেটার প্রতিযোগিতা চলত। তারপর ৮০/৮২ সালের দিকে আমীরে জামা'আতের ২/১টা প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করা হয়েছে। তাঁর সুর-স্বর ছাড়া বক্তৃতা শুনলাম। এছাড়াও মাওলানা আবু তাহের বর্ধমানী সুর-স্বর ছাড়া উচ্চাঙ্গের ভাষা ব্যবহার করতেন। তখন যে শিক্ষিত মহলে এ ধরণের ভাষার কদর আছে তা বুঝতে পারলাম।

এব্যাপারে জীবনে বেশ কয়েকটি আকর্ষণীয় ঘটনাও ঘটেছে। একবার বর্তমান 'আন্দোলন'-এর সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক নূরুল ইসলাম ভাইয়ের গাংনী ডিগ্রি কলেজে দাওয়াত পেলাম। সেখানে প্রফেসর ও অধ্যক্ষ মানের সুধীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সেখানে প্রধান আলোচক হিসাবে ড. লোকমান হুসাইন ও দ্বিতীয় আলোচক হিসাবে আমি। আলোচনা শেষ করে বের হয়ে আসার সময় অনেকেই বলল স্যার আপনি কি বাংলায় মাস্টার্স করেছেন? বললাম না, আমি একজন মাদ্রাসায় পড়া ছাত্র। কলেজ বা ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সুযোগ হয়নি। একজন প্রভাষক বলেই ফেলল, আজ আমার মাদ্রাসার ছাত্রদের উপর থেকে একটা ধারণা পাল্টে গেলো। আমি মনে করতাম, মাদ্রাসায় পড়লে শুধুমাত্র আযান, ইক্বামত দিবে ব্যাস এটাই শেষ।

তাওহীদের ডাক : দাওয়াতী ময়দানে কোন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছিলেন কী?

মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম : জীবনে অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হ'তে হয়েছে। বিশেষকরে, হানাফী পরিবেশ থেকে সালাফী মানহাজে আসতে ব্যক্তিগত জীবনে বহু যুদ্ধ-জিহাদ করতে হয়েছে। যেহেতু আমার শিক্ষা ব্যাকগ্রাউণ্ড আলিয়া। আর আলিয়া শিক্ষাব্যবস্থা মানেই প্রচলিত হানাফী মাযহাবের জয়জয়কার। যেমন কয়েকটি ঘটনা বলি-

প্রথমত : ১৯৮৯ সালে আমরা ১৮৮ জন ছাত্র কেশবপুর বাহারুল উলুম কামিল মাদরাসা থেকে কামিল পরীক্ষা দিয়েছিলাম। আমাদের সবাইকে এক সেট করে 'কুতুবে ছিত্তাহ' কিতাব মাদ্রাসা থেকে দেওয়া হয়েছিল। তখন কিতাবগুলো 'ছিয়া ছিত্তা' বলে পরিচিত ছিল। আমি যখন বুখারী ও মুসলিমে ছালাত অধ্যায় পড়তাম, তখন আহলেহাদীছদের ছালাতের সাথে অনেক বেশী মিল পেতাম। হানাফীদের ছালাতের সাথে ভয়ানক গড়মিল দেখতাম। বুখারীর উস্তাদজীদের প্রশ্ন করতাম তারা বলত, 'রফউল ইয়াদাইন না কারনে কা হাদীছ তিরমিযী মে আয়েগাঁ'। তিরমিযীতে যখন হাদীছ আসল তখন দেখলাম, '*লাম ইয়াছবুত হাদীছু ইবনে মাসঊদ আন্নান্নাবিয়্যা (ছাঃ) মান লাম ইয়ারফা' ইল্লা বিল ইবতিদা'* 'নবী করীম (ছাঃ) একবারের বেশী হাত উত্তোলন করেননি মর্মে ইবনু মাসঊদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছটি প্রমাণিত নয়'। একই হাদীছ আবু দাঊদে পেলাম, 'হাযাল হাদীছ লাইছা বি ছহীহ'। তখন মনটা খারাপ হয়ে যেত। মনে মনে ভাবলাম কিতাবগুলো আমার নিজেরই কেনা দরকার।

ঐ সময় আমার এক বন্ধুর সাথে ঢাকায় গেলাম। সেটা ছিল জীবনের প্রথম রাজধানী ঢাকাতে যাওয়া। টাকার স্বল্পতা থাকার কারণে শুধুমাত্র বুখারী-মুসলিম দুই দুই চার খণ্ড কিনলাম। কয়েক মাস পরে গিয়ে সুনানে আরবা'আর কিতাবগুলোও নিয়ে আসলাম। এবার আমি নিজের কিতাব থেকে পড়ি। মাদ্রাসা থেকে নেয়া কিতাবগুলো ফেরত দিতে গেলাম। তখন বোর্ডিং সুপার তাচ্ছিল্য করে বললেন, কি পড়বে তুমি? আমি কিতাব কিনেছি। কি কিতাব কিনেছো? টাকা বেশী হয়ে গেছে, তাই না?। পরে বুঝতে পারলাম যে, তারা চায় না এই কিতাব সাধারণ মানুষের নিকট পৌঁছাক। পৌঁছালে তাদের গোমর ফাঁস হয়ে যাবে। তারা চাচ্ছিল মফস্বল এলাকার লোকেরা তাদের নিকট আসবে আর তারা তাদের মত করে ঘটি বুঝ দিবে।

আমি কামিল পরীক্ষার পরে নিয়মিত অধ্যায়ন করতাম। আর আমার হাদীছের উপর দৃঢ়তা বেশী হ'তে লাগল। তখন তো বাংলা অনুবাদ শুধুমাত্র আধুনিক প্রকাশনীর ছিল। তার আগে অনুবাদ হয়েছিল আল্লামা আযীযুল হক্বেরটা। আর সেটা আসলে বুখারীর অনুবাদ না প্রতিবাদ তা বুঝাই দায়! এইভাবে ঈমান ও ইয়াক্বীনের সাথে দ্বীন বুঝলাম, আলহামদুলিল্লাহ।

দ্বিতীয়ত : ১৯৯২ সালের মার্চ মাসের দিকে আমার গ্রামে আমার নেতৃত্বে একটা বিশাল জালসা হ'ল। এই জালসায় আমি বক্তব্য দিচ্ছি এমন সময় আমার আপন চাচার নেতৃত্বে একটি মিছিল এসে জালসাটি পণ্ড করার চেষ্টা চালাল। তখন আমাদের গ্রামের জুবায়দুল হক নামের ডানপিটে স্বভাবের ছেলেটি মিছিলকে লক্ষ্য করে টর্চ লাইটের ফোকাস দিয়ে রেখা টেনে বলল, 'এই যে রেখা টেনে দিলাম যে এর মধ্যে আসবে সে আর মায়ের কোলে ফিরে যেতে পারবে না'। চাচা মিছিল থামিয়ে দিয়ে বেফাস গালিগালাজ করতে লাগল। পরে জানতে পারলাম, তিনি গণ্ডগোল বাঁধিয়ে মারামারি-রক্তারক্তির সব প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিলেন। আমার অপরাধ আমি লা-মাযহাবী।

আমি তখন খুব বিনয়ের সাথে চাচাকে বললাম, এখানে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হলে প্রশাসনিকভাবে আমরা সকলেই

ক্ষতিগ্রস্ত হব। প্রোগ্রাম শেষ করে আমি তো বাড়িতে যাবো। আর আমাকে মেরে ফেললে যদি সমাধান হয় তাহ'লে সেটা আপনি বাড়ি গিয়েই করবেন। আমার বংশের চাচাসহ দশ-বারোজন মুরুব্বী তাদেরকে যথাযথ সম্মান দেখিয়ে মঞ্চে আসতে বলা হ'ল। তাদেরকে বলা হ'ল, আমার অপরাধ কি? তারা বলল, না অপরাধ কিছু না। কিন্তু আমরা তোমার পূর্ব পুরুষ। যারা মারা গেছেন সবাই আমরা হানাফী। তুমি অন্যরকম আমল করছ। তাহ'লে তুমি কোন বেহেশতে যাবে আর আমরা কোন বেহেশতে যাব? বেহেশত কি দু'জনের জন্য আলাদা হবে?

আপনার প্রশ্নটি সুন্দর। আমি উত্তর দিচ্ছি ইনশাআল্লাহ। এর আগে আপনার কাছে আমার একটা ছোট্ট প্রশ্ন। একেবারে প্রস্তুতি ছাড়াই হঠাৎ করেই আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় এই বুদ্ধিটা আসল। এই জিজ্ঞাসার উত্তরটা যদি আপনি দেন তাহ'লে আমার উত্তর দিতে সুবিধা হবে। আমরা মাগরিবের ছালাত শেষ করে মাহফিলের কাজ শুরু করেছি। ধরুন এশার ছালাতের জন্য আযান হয়ে গেল। এবার ধরুন বাগদাদ থেকে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) চলে আসলেন এবং মদীনা থেকে নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)। দুই জনই আমাদের সামনে উপস্থিত। বলুন তো এশার ছালাতের জন্য আমরা কাকে ইমাম হিসাবে সামনে দিব? আমার চাচা বললেন, কেন মুহাম্মাদ (ছাঃ) থাকতে অন্য কারোর প্রশ্নই আসে না। উনিই ইমামতি করবেন।

বুখারী শরীফ ডান হাতে উঁচু করে আমি বললাম, আজকে নবীজী নাই কিন্তু তার প্রতিনিধিত্ব করছেন এই বুখারী শরীফ। বাম হাতে হেদায়া উঁচু করে ধরে বললাম, আজকে ইমাম আবু হানীফা নাই কিন্তু তাঁর প্রতিনিধিত্ব করছে, এই হেদায়া। আপনার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমি হেদায়ার ইমামতি না মেনে বুখারীর ইমামতি মেনে নিয়েছি। অর্থাৎ আবু হানীফার ইমামতি না মেনে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ইমামতি মেনে নিয়েছি। আমি কি অপরাধ করেছি? এবার আমার চাচা মাইকটা টেনে নিয়ে সবাইকে বলল, ও হচ্ছে জাদুকর। তোমাদের ও কথায় ভুলিয়ে রাখবে, ওর সাথে যুক্তিতে পারা যাবে না। অবশেষে চাচা বলল, বংশীয়ভাবে ওকে আমরা বয়কট করবো।

তখন আমি একটু হেকমত খাটিয়ে বললাম, কে এই কথাগুলো বলছে? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। কার কণ্ঠে ভেসে আসছে? কথকের পরিচয় যদি জানতে পারতাম, তাহ'লে আমি জিহ্বা টেনে ছিড়ে ফেলতাম। আমার বংশে যারা মুরুব্বী, যারা সম্মানিত, শিক্ষিত ব্যক্তি, তাদেরকে এভাবে ভর্ৎসনা করা হচ্ছে, ডাক দেওয়া হচ্ছে। তারা কি কিছুই বুঝেন না? যারা এখানে আছেন তারা তো বুঝার জন্যই এসেছেন। তখন উপস্থিত অন্যান্য চাচারা আমাকে বলল, তোমার কিছু করতে হবে না, বেয়াদবটাকে আমরাই শাসন করছি। এই বলে তারা উঠে গেলেন। আর আমরা রাত্রি ১টা পর্যন্ত মাহফিল করলাম। তারপর আমি যে আহলেহাদীছ হয়ে গেছি তা জনসম্মুখে জোরেশোরে প্রচার হয়ে গেল, ফালিল্লাহিল হামদ!

তাওহীদের ডাক : ২০০৫ সালে ২২শে ফেব্রুয়ারীর আমীরে জামা'আতের গ্রেফতারের সেই ভয়াল রাত্রির অনুভূতি জানতে চাই।

মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম : সে সময় ভিতরে-বাইরে বিভিন্ন চক্রান্তের কথা আমার খুব মনে পড়ে। দ্বিমুখী চরিত্রগুলো সেদিন পাখা মেলেছিল। এমনিতেই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের প্রশাসনিক ঝামেলায় আমীরে জামা'আত সহ বিভিন্ন নেতাকর্মীদের অসহ্য যন্ত্রণা পোহাতে হচ্ছিল। ঠিক সেই সময় আমাদের সংগঠনের তদানীন্তন নেতাদের মধ্যে রাজনৈতিক স্পৃহা জাগ্রত হ'ল। রাজনৈতিক প্লাটফর্মে নেমে রাজনৈতিক দল গঠন করতে হবে। তা না হলে আমরা এই সরকারের নির্যাতন-নিপীড়ন থেকে রক্ষা পাব না। এই কথার সাথে অনেকেই একমত হ'ল। আর আমি তখন মজলিসে শূরা সদস্য এবং খুলনা যেলার সভাপতি। শূরা মিটিং-এ অনেকেই একমত, অনেকেই নিরব। বলতে গেলে আমি একাই সরব।

এ নিয়ে অনেক কথা। আমীরে জামা'আতের মুক্তির দাবীতে খুলনার ঐতিহাসিক জিয়া হলে আমরা সম্মেলন করলাম। সেখানে হানাফী ঘরানার আলেম খুলনা আলিয়া মাদ্রাসা প্রিন্সিপাল শায়খ মানোয়ার মাদানী, ইসলামী আন্দোলনের নেতা সাখাওয়াত হোসেনসহ আহলেহাদীছদের দেশ বরেণ্য আলেমদের উপস্থিতিতে বিশাল জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হ'ল। প্রশাসনের উপর এর অত্যন্ত ইতিবাচক একটা প্রভাব পড়েছিল। হানাফী ভাইয়েরাও আমীরে জামা'আতের উপর খুব সংবেদন শীল হয়ে পড়েন। তারাও স্যারের মুক্তি কামনা করেন।

পরবর্তীতে ২০০৮ সালে তৎকালীন সংগঠনের উর্ধ্বতন দায়িত্বশীল হোটেল টাইগার গার্ডেনে আমাকে খুব শক্ত করে ধরে রাজনৈতিক দল 'বাংলাদেশ ইনসাফ পার্টি' সম্পর্কে বললেন। তারা আমাকে প্রস্তাব দিলেন, খুলনার এই আসনে নির্বাচনী ক্যান্ডিডেট হিসাবে তোমাকে মনোনয়নপত্র কিনতে হবে। এটা শুনে আমি খুব আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলাম।

আমি বললাম, নির্বাচনে দাঁড়ানো তো দূরের কথা, এ নীতিকে আমি কোনকালেই সমর্থন করতে পারি না। ঠিক আছে আমি দাঁড়াবো। এর আগে একটা কাজ করেন, মুহতারাম আমীরে জামা'আতের লেখনীগুলো সব আগে পুড়িয়ে দিন। যে স্তম্ভের উপর আমি দাঁড়িয়ে আছি, তা একটি পরিপূর্ণ সমাজ সংস্কারবাদী সংগঠন। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ বিরোধী কোন তন্ত্রমন্ত্রের পক্ষে আমি থাকতে পারব না বলে সাফ জানিয়ে দিলাম।

তাওহীদের ডাক : আপনি কত সালে পীস টিভিতে গিয়েছিলেন?

মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম : ২০১৪ সালে।

তাওহীদের ডাক : আমীরে জামা'আত আপনাকে খুব বেশী ভালোবাসে আবার ভুলত্রুটিতে বকা দেয়। আপনাদের উপর তাঁর এত ভালবাসা, আপনার কেমন মনে হয়?

মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম : মুহতারাম আমীরে জামা'আত আমাকে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসেন কি না, তা জানি না। তবে আমার সাংগঠনিক জীবনে আমীরে জামা'আতের নির্দেশনা বা বকা যাই বলি না কেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে 'আতীউল্লাহ ওয়া আতীউর রাসূল ওয়া উলিল আমরে মিনকুম' মনে করি। আমীরের আনুগত্য করতে গিয়ে যদি ব্যত্যয় হয় আর তিনি যদি আমাকে বকা বা তিরস্কার করেন, তবে সেটি আমি পুরস্কার হিসাবে মনে করি।

একটা ঘটনা খুলেই বলি। আমি দীর্ঘদিন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য ছিলাম। একবার খুলনায় জমি কিনতে গিয়ে অনেক টাকার প্রয়োজন হয়। আমি একান্ত বাধ্য হয়ে ব্যাংক থেকে চার লক্ষ টাকার লোন নিয়ে জমিটা কিনেছি। কোনভাবে এই তথ্যটি মুহতারাম আমীরে জামা'আত শুনে ফেলেন। তিনি একদিন আমাকে বললেন, তুমি কি ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে জমি কিনেছ? আমি অকপটে বললাম, জী, স্যার। তাহ'লে তোমার এই কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য পদ বাতিল করা হ'ল, যেহেতু তুমি সূদী লেনদেন করেছ। আমি বললাম, আলহামদুলিল্লাহ! আপনি আমার জন্য দো'আ করুন মহান আল্লাহ এই কারণে ক্বিয়ামতের মাঠে যেন আমাকে মাফ করে দেন। আমি একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও অপারগবশতঃ ঋণ নিয়ে ফেলেছিলাম। আর এ কারণে আমার ডিমোশন হচ্ছে। আমি কিছুই মনে করব না। আমি চাই 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' এই হকের পথে যেন আজীবন বেঁচে থাকে। এখান থেকে যেন অন্যরা শিক্ষা নিতে পারে। আমি এখন সাধারণ পরিষদ সদস্য। আমীরে জামা'আত দো'আ করেছিলেন, বিধায় দ্রুত সময়ের মধ্যে লোনটা পরিশোধ করে দিয়েছি। এটা আমার জীবনে একটি স্মরণীয় ঘটনা। আমীরে জামাআত এমনই এক আপোষহীন ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর কর্মীদের উপর সর্বদা রাখেন যে, আমার মত একজন পুরোনো ও একান্ত ভালোবাসার পাত্র সাথীকেও তিনি অপরাধের শাস্তি দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি। নিঃসন্দেহে কর্মীদের হক্বের উপর টিকে থাকার জন্য এমন ঘটনাগুলো প্রেরণা যোগাবে।

তাওহীদের ডাক : তাওহীদের ডাক পত্রিকার পাঠকদের উদ্দেশ্যে কিছু জন্য নছীহত কর"ন?

মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম : রাসূল (ছাঃ)-এর নাযিলকৃত অহীর প্রথম শব্দটিই হ'ল 'পড়'। এজন্য অধিক পরিমাণে পড়তেই হবে এবং জানতে হবে। 'তাওহীদের ডাক' একটি বৈপ্লবিক চিন্তা-চেতনার বহিঃপ্রকাশ সম্বলিত একটি দ্বি-মাসিক পত্রিকা। আমি মনে করি, যুবসমাজের জন্য 'তাওহীদের ডাক' পত্রিকাটি পড়ার কোন বিকল্প নেই। আমি পত্রিকাটির সার্বিক উন্নতি কামিনা করছি। তাওহীদের ডাক পত্রিকা সংশ্লিষ্ট সকলকেই আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

তাওহীদের ডাক : জাযাকাল্লাহ খায়রান! আপনাকেও আমাদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও মুবারকবাদ রইল।

At-Tahreek TV

অহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য

অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল 'আত-তাহরীক টিভি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছভিত্তিক দ্বীনি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে যাচ্ছে। আমাদের নিয়মিত আয়োজন দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, প্রশ্নোত্তর পর্ব, নবীদের কাহিনী, হাদীছের গল্প, ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথে সহ অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমূহ দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন।

Youtube লিংক :
www.youtube.com/attahreektv

Facebook লিংক :
www.facebook.com/attahreektv

সার্বিক যোগাযোগ :
আত-তাহরীক টিভি, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৪০৪-৫৩৬৭৫৪।
ইমেইল : attahreektv@gmail.com

লেখা আহ্বান

ইসলামের বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সুস্থ সাহিত্য বিনির্মাণের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে এগিয়ে চলেছে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র **'তাওহীদের ডাক'**। সত্যানুসন্ধিৎসু যুবক, ছাত্র ও লেখকদের নিকট থেকে বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন, মনীষী চরিত, সাময়িক প্রসঙ্গ, কবিতা, মতামত, শিক্ষণীয় গল্প প্রভৃতি বিষয়ে লেখা আহ্বান করা হচ্ছে।

-সহকারী সম্পাদক

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কর্তৃক আয়োজিত কর্মী সম্মেলন ২০২১- এ আমীরে জামা'আত

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রদত্ত ভাষণ

গত ৯ই সেপ্টেম্বর'২১ রাজশাহী নওদাপাড়াস্থ কেন্দ্রীয় মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কর্তৃক আয়োজিত কর্মী সম্মেলন ২০২১- এ আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** প্রদত্ত ভাষণ-

اَلْحَمْدُ لِلهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَي مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ.

সূরা আলে ইমরানের ১১০নং আয়াতকে সামনে রেখে তিনি বলেন, আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন সৎকাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ ও আল্লাহ্র প্রতি ঈমান। যারা সৎকাজের আদেশ দেয় ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে, কিন্তু নিজেরা আমল করে না, তারা দ্বিমুখী নীতির অধিকারী। এ থেকে সবাইকে সাবধান থাকতে হবে। আর যদি তা না করে তাহ'লে সে মুনাফিক। আল্লাহ কোন মুনাফিককে পসন্দ করেন না। আমি যেটা করি না, সেটা যদি নিষেধ করি। এটাও মুনাফিকী।

আদেশ দেওয়া বিশাল কঠিন কাজ। কিন্তু উপদেশ দেওয়াটা খুব সহজ। 'আল-আমরু বিল মা'রুফ' এই যে আয়াতটি কম বেশী সবাই জানে। তাহ'লে বিশেষ করে যুবকদের জন্য সংগঠন কেন? সংগঠন হচ্ছে একটি বট গাছের মত। সেখানে আট বছরের শিশুও ছায়া পাবে। আবার আশি বছরের বৃদ্ধও সেখানে ছায়া পাবে। তাহ'লে আবার পৃথক 'যুবসংঘ' কেন? রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'সাত শ্রেণীর মানুষ ক্বিয়ামতের কঠিন দিবসে আল্লাহ্র ছায়ার নীচে ছায়া পাবে। তার মধ্যে একশ্রেণী হ'ল ঐ যুবক যারা আল্লাহ্র ইবাদতের মধ্য দিয়ে বড় হয়েছে' *(বুখারী হা/৬৬০)*। যুবককে কেন আল্লাহ খাছ করলেন, বৃদ্ধকে বললেন না। আল্লাহ রাসূল এখানে খাছ করে যুবকদের কেন বললেন? সমাজের মূল মেরুদণ্ডই হচ্ছে যুবকরা। যুবসমাজ যদি সৎকর্মশীল হয়, সে দেশে অন্যায় কর্ম হ'তে পারে না। যে দেশের যুবশক্তি বিনষ্ট হয়ে যায়, সেদেশে কোনকিছুই টিকবে না। সব ধ্বংস হয়ে যাবে। রাসূল (ছাঃ) তাঁর কর্মজীবনে নবুঅতের পূর্বে 'হিলফুল ফুযূল' গঠন করেছিলেন। নবুঅত প্রাপ্তির পরে তাঁর সঙ্গে যারা ছিলেন তারা প্রায় সবাই যুবক। এমনই একজন যুবক আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা কাফেরদের বিরুদ্ধে কবিতা পাঠ করছিলেন। ওমর ফারুক বললেন, এই আব্দুল্লাহ! তুমি তাওয়াফরত অবস্থায় কবিতা পাঠ করছ? রাসূল বললেন, থাম ওমর, আব্দুল্লাহকে কবিতা পাঠ করতে দাও। কেননা তার একেকটি কবিতা কাফেরদের জন্য তীর বর্ষণের সমতুল্য। ওকে বলতে দাও।

আজকের আধুনিক বিশ্ব যে মুসলিম মধ্যপ্রাচ্য দেখছে তা একজন যুবক আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার সিদ্ধান্তের ফসল। তখন পুরো মধ্যপ্রাচ্য খ্রিষ্টান বাইজানটাইন সম্রাট হিরাক্লিয়াসের আয়ত্ত্বাধীন ছিল। তদানিন্তনকালের বিশ্ববিজয়ী রোমক সাম্রাজ্যের দুই লক্ষ চল্লিশ হাযার সৈন্যের বিরুদ্ধে মাত্র তিন হাযার সৈন্যের যুদ্ধ হবে, এটা কিভাবে সম্ভব? মুরুব্বীরা সিদ্ধান্তে বসে গেলেন, কি করা যায়? মজলিসের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হ'তে যাচ্ছিল যে, যুদ্ধ না করেই ফিরে যাবে। অথবা কাউকে পাঠাবে মদীনায়, পরবর্তীতে আল্লাহ্র রাসূল কি নির্দেশ দেয়। ইতিমধ্যে যুবক আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা ছুটে এলেন, হে মুরুব্বীরা! আপনারা কি সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন? তাদের জবাব শুনে সে বলল, আমরা এখানে কি জন্য এসেছি, হয় যুদ্ধে জয়লাভ, নয়তো শাহাদৎ। তারা বলল, হ্যাঁ, কথা ঠিক। তাই যদি হয় যুদ্ধ জয় হবে আল্লাহ্র হুকুমে। চলুন! যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ি আল্লাহ্র উপর তায়াক্কুল করে। হয় বিজয়ী হব অথবা শহীদ হব, দু'টিই আমাদের লাভ। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল, আল্লাহ পাক তাঁর দো'আ কবুল করলেন। মাত্র ১২জন শহীদের বিনিময়ে দুই লক্ষ চল্লিশ হাযার সৈন্য কোথায় পালিয়ে গেল, তার কোন হদিস নাই। ঐ দিন একজন যুবকের একটা কথায় পুরা মধ্যপ্রাচ্য পরিবর্তন হয়ে গেছে।

বাংলার যমীনে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র এরকম মুজাহিদ বান্দা তৈরী হয়ে গেলে, প্রত্যেক যেলায় একটা করে থাকলে পুরা দেশ পরিবর্তন হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। ঐ যুবকদের আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি। সব জায়গায় ভীরু-কাপুরুষদের মেলা। এক পা হাটলে তিন পা পিছাই। এসব দিয়ে কোন কাজ হবে না। আমার এক ঠিকানা ভূপৃষ্ঠে, আরেক ঠিকানা হচ্ছে চিরস্থায়ী জান্নাত। আর এর মাঝখানে কিছুই নাই। যতদিন বেঁচে আছি পরকালের পাথেয় সঞ্চয় করার জন্যই বাঁচব। আমার প্রতিটি কথা, প্রতিটি কাজ ও পয়সা স্রেফ জান্নাতের জন্য ব্যয় হবে। তোমাদের মনের কথা বলতে পারবো না, জিজ্ঞাসা করছি শুধু আল্লাহকে সাক্ষী রাখার জন্য, তোমরা কি এরকম যুবক হ'তে পারবে? (সমস্বরে সবাই- ইনশাআল্লাহ)।

দুনিয়াবী কোন স্বার্থের কাছে কখনো মাথা নত করবে না। বাতিলের সাথে কোন আপোস নাই। কুরআন ও হাদীছ যেখানে, আমার জীবন সেখানে। আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর একটা হাদীছের জন্য দশবার মরতে প্রস্তুত আছি। এই মেজায যদি তোমাদের তৈরী হয়ে যায়, ইনশাআল্লাহ দুনিয়ায় তোমাদের কেউ ঠেকাতে পারবে না। কোন শক্তি তোমাকে দমাতে পারবে না, নির্মূল করতে পারবে না। ১৮ কোটি মানুষের জন্য মাত্র ১৮টি যুবক লাগবে। সারা বাংলা পরিবর্তন হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

খবরদার! দুনিয়াবী কোন স্বার্থ নিয়ে নিজেকে শেষ করে দিয়ো না। দুনিয়া সবচেয়ে ক্ষতিকর, আর শয়তান লেগে আছে ধ্বংস করার জন্য।

বিরোধীরা ফতোয়া দিয়ে বায়'আত নিয়ে বির্তক সৃষ্টি করে আমাদের মধ্য থেকে ইসলামের মূল স্পিরিট ধ্বংস করছে। বাংলার যমীনে শুধু ইমারত ও বায়'আতের দীক্ষা আমাদের সংগঠনেই রয়েছে। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' এই মৃত সুন্নাতকে যিন্দা করার জন্য ইনশাআল্লাহ শত শহীদের ছওয়াব পেয়ে যাবে। এই মেজায যেন তোমাদের থাকে। আমরা কারো নামে শপথ করিনি, আল্লাহ্র নামে বায়'আত করেছি। ব্যাস খালাস!

প্রতিটা কাজ করার আগে আমাকে চিন্তা করতে হবে যে, এই কাজে গুনাহ আছে না নেকী আছে। নেকী থাকে করবো আর কোন ব্যাখ্যার দরকার নেই। ফতোয়া দিয়ে মানুষের ক্ষতি হয়ে গেলে, সে ফতোয়ায় লাভ কী? এজন্য করণীয় সম্পর্কে তোমাদের গঠনতন্ত্র, ইহতিসাবে সবই বলা আছে।

আমি যুবসংঘে'র প্রতিটি কর্মী ভাইকে বলল, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? বইটি অন্তত দুই মাসে একবার শেষ করবে। আর থিসিসটা তিন, চার মাসের মধ্যে একবার শেষ করবে। যুবসংঘের ছেলেদের ব্রেন ভালো, বয়স কম তোমাদের পড়ার বয়স, আর তোমরা যদি বই না পড় এবং মুভমেন্টে থাক, তাহ'লে কিছুই বুঝতে পারবে না। আর আমাদের পূর্বসুরী মুরুব্বীদের কথা যদি তোমরা না জানো, আগামীতে গিয়ে কোন কূল কিনারা পাবেনা।

গত জুম'আয় বলেছিলাম। আহলেহাদীছ গ্রামগুলোতে গিয়ে ২টা কুরআনের আয়াত পড়ে ২মিনিট দারস দিলে তোমাকে তাড়িয়ে দিবে, এমন কোন মুসলমানের বাচ্চা নাই। মসজিদ ভিত্তিক সংগঠন গড়ে তোল। আর যদি তা না পার, তবে মসজিদ ভিত্তিক সংগঠনের কোন প্রয়োজন নেই। তোমার বাড়িতে যদি তিনটা লোক থাকে, তাহ'লে তাদেরকে নিয়ে সংগঠন কর। সংগঠনবিহীন জীবন যেন কারো না থাকে। সারা দেশে, গ্রামে গ্রামে আহলেহাদীছ আদর্শ ছড়িয়ে পড়ুক, সে কামনা তোমাদের নেই? ছড়াবে কে? নিজেকে যেতে হবে না? একে অপরের ভুল ধরে সময় নষ্ট করো না। যে নিজে যত বেশী দাওয়াত দিতে পারবে, তত বেশী নেকী পাবে। নেকীর পাগল হও। পাগলামী ছাড়া কোন কিছু অর্জন হয় না। কথায় কথায় যারা হিসাব করে পা ফেলে, তাদের দ্বারা কিছু হয় না। আমীরের নির্দেশ- দাওয়াত দিতে হবে, কি করে দিবে তা জানি না। মনে রাখবে, যে পা ফেলে না, তার কি হোঁচট লাগে? সে তো হাটে না, তাহ'লে কি করে হোঁচট লাগবে? আর যে ঘরে বসে থাকে, তার কিছুই হয় না।

আমার দাবী তোমাদের কাছে- আহলেহাদীছ আন্দোলনের বাহক হিসাবে দাওয়াত মাঠে, ঘাটে, হাটে সব জায়গায় ছড়িয়ে দিবে। এজন্য থিসিসের মধ্যে বাংলায় মাওলানা বেলায়েত আলীর দাওয়াতী চ্যাপ্টারটা পড়ে দেখ।

তিনি যখন কোথাও যেতেন, তার দুই থেকে আড়াই মাস সময় লাগত। যদি মাঠে কোন কৃষক লাঙ্গল চাষ করত, তার কাছে দাওয়াত দিতেন। যদি কোন বাযার অতিক্রম করতেন, সেখানে দাওয়াত দিতেন। যদি দোকান পেতেন, সেখানে দাওয়াত দিতেন। আর এভাবে দাওয়াতী কাজ করতে গিয়ে ২ মাস সময় লেগে যেত। আমরা এই সমস্ত মনীষীদের দাওয়াতী ফসল।

আমার আব্বা মাওলানা আহমাদ আলীর জীবনী পড়ে দেখ। তিনি জোঁকের কামড় কিভাবে খেয়েছেন, তিনি গামছা নিয়ে যেতেন এবং পানিতে সাঁতার দিয়ে ঐ পাড়ে গিয়ে আবার কাপড় পরতেন। আর লবণ নিয়ে যেতেন জোঁক ছাড়াবার জন্য। জোঁকের কামড় খেয়ে পা গুলো লাল হয়ে যেত। আব্বা জোঁকের কামড় খেয়ে দাওয়াত দিয়েছেন বলেই সাতক্ষীরার আশাশুনি উপযেলা ও বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণে কালাবগী-সুতারখালী গ্রামগুলি এখন আহলেহাদীছ।

এই সমস্ত মুরুব্বীরা দাওয়াতী কাজ করেছে বলে আমরা সেখানে সংগঠন করছি। আমরা তো বিমান ছাড়া চলি না; মাইক্রো ছাড়া চলি না। আমরা তাদের সমতুল্য হতে পারব না। আর আমাদের যুগ ডিজিটাল যুগ। আমরা ইচ্ছা করলে ঘরে বসে এখন দাওয়াত দিতে পারি। তখন সে সুযোগ ছিল না। এক মোবাইলে আপনি দাওয়াত দিতে পারেন। অনলাইনে আপনি দাওয়াত দিতে পারেন। কিছু দিন আগে যুবসংঘে'র ভার্চুয়াল বেশ কিছু বড় প্রোগ্রামও হয়েছে।

'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' হবে আদর্শ মডেল। এক জঙ্গলে বাঘ আর ছাগল এক সাথে মিটিং করতে পারে? বসার আগে খেয়ে ফেলে দিবে। তাই না? ঐ দুইটা পশু কিন্তু বৈশিষ্ট্যগতভাবে আলাদা। সে যুগে কোন ওহাবী যদি গ্রামে ঢুকতে তাহ'লে তো ঐ গ্রামে ভয়ে কম্পন শুরু হয়ে যেত। তার কারণ হচ্ছে ওহাবীরা শুধু ভুল ধরে। মেয়েরা সব পালিয়ে ঘরে ঢুকত। তখন কোন পর্দা ছিল না। বাড়ির পাশে কোন প্রাচীর নেই। কেউ বাড়িতে দাওয়াত দিতে আসলে আব্বা বলতেন, বাড়িতে পর্দা আছে? যে বাড়িতে পর্দা না থাকত, তাকে বলতেন, তাহ'লে পর্দা বানাও, তারপর এসো। তখনকার দিন মানুষের পায়খানা ঘর ছিল না। ঝাড়ে, বাগানে গিয়ে মানুষ প্রয়োজন সারতো। কলা গাছের পাতা দিয়ে পর্দার ব্যবস্থা হলে, আব্বার কাছে রিপোর্ট দিলে তারপর আব্বা যেতেন। আর এ সমস্ত কাজের জন্য আহলেহাদীছ সমাজটা গড়ে উঠেছে।

রাফঊল ইয়াদাইন, জোরে আমীন বললেই শুধু আহলেহাদীছ হওয়া যায় না। শুধু এদিয়ে জান্নাত পাওয়া যাবে না। হ্যাঁ, আমাদের নবী কিভাবে পায়খানা করতেন, তাও শিক্ষা দিয়েছেন। পূর্ব-পশ্চিম বসার জ্ঞানও তিনি আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন। আমাদের যুবসংঘের ছেলেরা যেখানেই থাকবে, সেখানেই প্রতিটি পদে পদে এইভাবে সংস্কার করবে।

দাড়ি কাটা লোকটা কোন দলের লোক চেনা যায়। দাড়ি ছাটা ওটা কোন দলের লোক চেনা যায়। আর 'যুবসংঘে'র ছেলেদেরকে দাড়ি কাটা-ছাটা কোনটাই চলবে না। আবার টুপি দেখলেও চেনা যায়, চেনা যায় না? কয় কলি? সাবধান অন্যদের অনুকরণ করো না। তোমার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল থাকো। তাহ'লে জীবনটা স্বার্থক হবে। আল্লাহ্র ইবাদতে

যৌবনকে গড়ে তোলো। তাহ'লে ইহকালে পরকালে তুমি হবে শ্রেষ্ঠ যুবক। শ্রেষ্ঠ উম্মতের দলভুক্ত হ'তে পারবে ইনশাআল্লাহ। আজকে তুমি যুবক, কাল তোমার সন্তান তোমাকে দেখে শিখবে। আর বাবা যদি সঠিকভাবে গড়ে না ওঠে, তাহ'লে ঐ সন্তানের অবস্থা কি হবে?

আমরা যখন যুবসংঘ শুরু করেছিলাম, তখন আমার সাথীরা সবাই ছিল যুবক। এখন অনেকেই আমাদের ছেড়ে চলে গেছে আবার কেউবা অসুস্থ। আল্লাহ আমাকে এখনও সুস্থ রেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ। স্মৃতিচারণ করলে নিজের কাছে মনে হয়, অনেক বয়স হয়ে গেছে। আর বাঁচার প্রয়োজন নাই। তবুও আল্লাহ আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। তোমাদের কাছে আমার দাবী, যতক্ষণ নিশ্বাস আছে ততক্ষণ পরকালের পাথেয় হাসিল করো। তোমার দ্বারা একজন মানুষও যদি হেদায়াত পায়, তাহ'লে সেটাই তোমার জান্নাতে যাওয়ার অসীলা হয়ে যাবে।

যত পারো বই বিতরণ করো। আমরা যখন যুবসংঘ শুরু করি, তখন আমাদের কোন বই ছিল না। স্রেফ আমরা যবান দিয়ে দাওয়াতী কাজ শুরু করি। কেউ তো আমাদের চিনতো না। ১৯৭৯ সালের জুলাইতে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন' বইটা লিখলাম। তখন এত বাধা ছিল যে, আমি প্রথমে খুৎবা দিতে গিয়েছিলাম ঢাকার ধামরাইতে। আমাকে দেখে ইমাম ১২:৩০-এর খুৎবা ১২:২০ খুৎবায় শুরু করে দেয়। শুরুতেই এই হিংসা, সেটাও আহলেহাদীছ মসজিদে, যেখানে ফাযিল মাদরাসা আছে। তাদের ধারণা, এই ছেলে খুৎবায় উঠলে সব শেষ করে দিবে। তাহ'লে বুঝ, তারা কেমন আহলেহাদীছ, আর আমি কেমন আহলেহাদীছ! লাভ কিছুই হলো না। আমি মিসকীন বসে আছি, মুছল্লীরা সবাই ডেকে নিয়ে সামনে নিয়ে চলে গেল। আমার বক্তব্য হয়ে গেল ২ ঘন্টা, একটা মুছল্লীও ওঠেনি। প্রথম থেকে বাধা শুরু হয়েছে, ঘরের বাধা, রাষ্ট্রের বাধা। সব বাধা ডিঙ্গিয়ে এখন সব ভালো আলহামদুলিল্লাহ। পরবর্তী সময় যেন আল্লাহ তোমাদের বাধাগ্রস্ত না করেন। তবে সত্যি কথা কি, যদি বাধা না আসে তাহলে কাজে কোন গতিও আসে না। এজন্য সরকার ছোট পাথরের পরিবর্তে রাস্তায় বড় বড় পাথর দিয়ে রাস্তা বানাচ্ছে। যাতে করে ড্রাইভার রাস্তায় ঘুমিয়ে না পড়ে। তোমরা হুটরা রাস্তায় চল, প্লেইন রাস্তায় চলো না। তা না হলে তোমরাও ঘুমিয়ে পড়বে। বাধাবিঘ্ন হওয়ার দরকার আছে, না হলে আগাবে কিভাবে? আমরা যখন কারাগারে গেলাম, তখন মিছিলে মিছিলে সারা দেশ মুখরিত হয়ে উঠেছিল। এখন আর মিছিল হয় না। আবার আর একবার যাওয়া লাগবে, তাহ'লে আবার সবাই চাঙ্গা হবে।

বছরে তোমরা একবার ইজতেমাতে আস। আর আমি বলব নিজ নিজ যেলাতে জালসা করা বাদ দাও। প্রত্যেক মসজিদে মসজিদে তা'লীমী বৈঠক করো। তাবলীগ জামা'আত কোন জালসা করে? ওদের লোক এত বেশী কেন? তোমরা বাড়ির মসজিদ এবং পাশের অন্য আরেকটি মসজিদে তা'লীমী বৈঠক কর। মসজিদে লোক থাক আর না থাক তোমরা তা'লীম দাও। তোমরা আমার সাথে ওয়াদা করো।

ইংল্যাণ্ডের এক প্রধানমন্ত্রী প্রথমবার জনগণের সামনে দাঁড়িয়ে কথাই বলতে পারেনি। জনগণ বলল, এ কোথাকার কে? যে কথাই বলতে পারে না? লজ্জায় তার মাথা হেট হয়ে গেল। সে বাড়িতে খেজুর গাছের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুরু করে দিল। শ্রোতা হ'ল খেজুর গাছ আর সে নিজে হ'ল বক্তা। অবশেষে সে ইংল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ বক্তা হয়ে গেল। তোমরাও এভাবে ভাল বক্তা হওয়ার চেষ্টা করবে। জাকির নায়েক কথা বলতে গিয়ে তোতলামি করত। আর এখন সে পৃথিবীর সেরা বক্তা।

উপমহাদেশের এমনই একজন আলেম আব্দুর রউফ ঝান্ডানগরী (নেপাল) প্রথম জীবনে ছাত্র হিসাবে দূর্বল ছিলেন। তার পিতা চৌদ্দ বিঘা জমির উপরে 'সিরাজুল উলূম' মাদরাসা খুলেছেন। ছেলের মাথায় কিছু নাই। তিনি ছেলেকে মানুষের মত মানুষ করার জন্য ভারতের কসাই খ্যাত একজন আলেমকে ভাড়া করে নিয়ে আসলেন এবং তিনি তাকে তার ছেলেকে পিটিয়ে একজন যোগ্য আলেম বানানোর কাজ দিলেন। এই লোকটিই ক্লাসে ফাস্ট ছাড়া আর সেকেন্ড হননি। শুধু তাই নয় তিনি পরবর্তীতে 'খতীবে হিন্দ' উপাধিতে ভূষিত হন। ভারতে দিল্লী রহমানিয়া মাদরাসায় প্রতি বছর একটা করে উপস্থিত বক্তৃতার প্রতিযোগিতা হত। সারা ভারতের ভালো মাদরাসায় ভালো ছাত্ররা সেখানে যেত এবং সেখানে ভারতের সেরা সেরা আলেমরা উপস্থিত থাকতেন। বিশেষকরে ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, আল্লামা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী মত বিখ্যাত আহলেহাদীছ আলেমরা সেখানে উপস্থিত থাকতেন। বিষয় ছিল 'নবীজীর জীবনী' এবং সময় পাঁচ মিনিট। কিন্তু তার বেলায় সময় কমিয়ে দুই মিনিট করা হ'ল। এই দুই মিনিটেই তিনি মজলিস একেবারে কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন এবং শ্রেষ্ঠ বক্তার খেতাব ছিনিয়ে নিয়েছিলেন।

'যুবসংঘে'র ছেলেদের বলব, তোমরা আমাদের বইগুলো ভাল করে পড়। মনে রেখ, যুবসংঘ একটি ইউনিভার্সিটি আর 'যুবসংঘে'র বইগুলো পড়লে তা হবে দশবার ভার্সিটি থেকে ডিগ্রী নেওয়ার সমতুল্য। দশবার কামেল পাশ করেও তা পাবেনা। যুবসংঘে'র গঠনতন্ত্র, কর্মপদ্ধতি, ইহতিসাব ভালো করে পড়, সেখানে সব বলে দেওয়া আছে, পড়লে তোমরা সব নিজেরাই পারবে।

'যুবসংঘে'র প্রতিটি কর্মীকে দশ মিনিটের বক্তব্যকে দুই মিনিটেই ফুটিয়ে তুলতে হবে। যেমনভাবে সূরা আছরের শিক্ষা দশ মিনিটেও বলা যায় আবার দুই মিনিটেও বলা যায়। তাহ'লেই তোমরা নিশ্চয়ই সম্মানিত হবে ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে বলব, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জান্নাতের লক্ষ্যে কাজ করে থাকে। নিজ নিজ এলাকায়, নিজ নিজ গ্রামে, নিজ নিজ শহরে যেন যুবসংঘে'র ছেলেরা মডেল হয়ে

গড়ে ওঠে। তোমাদেরকে সন্ত্রাসী, জঙ্গী আর কত কিছু বলবে মানুষ, তার কোন ইয়ত্তা নাই। কোন কিছু বলে তোমাদের ঠেকাতে পারবে না। এযাবৎ কেউ পারে নাই, খুব চেষ্টা করেছে। ইনশাআল্লাহ আগামীতেও পারবে না, যদি তোমরা আদর্শের উপরে টিকে থাকতে পারো। আহলেহাদীছ যুবসংঘ কখনো জঙ্গী বা সন্ত্রাসী কিছুই নয়। আমরা সর্বদা মধ্যপন্থী। আমরা শুধু মানুষকে 'ন্যায়ের আদেশ করবো আর অন্যায় থেকে নিষেধ করবো'। নিষেধ করলে গা জ্বালা করে, সবার গা যত জ্বলে জ্বলুক, আমাকে বলতে দিতে হবে। আমি জেলে গেল তো আর সবাই বাহিরে থাকবে। অতএব চিন্তার কারণ নেই।

একটি কথা সর্বদা কর্মীরা মনে রাখবে 'যত বেশী সফর করবে তত বেশী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়বে'। সফর নাই, আন্দোলন নাই। যতই তুমি বই লেখে ডিপো হও, লাভ নাই।

আমি যদি 'যুবসংঘ' হই, তাহ'লে আপনি 'যুবসংঘ', মুরুব্বীরাও 'যুবসংঘ'। কিসের প্রতিষ্ঠাতা, কিসের আমীর, কিছুই না। আমি আল্লাহ্র গোলাম, খাদেম।

'যুবসংঘে'র প্রতেক্যটা কর্মীকে নিরহংকার হ'তে হবে। অলসতা, বিলাসিতা বাদ দিতে হবে। হক কথা বলতে হবে সুন্দর আচরণ দিয়ে, বদমেজাযী হওয়া যাবে না। আক্বীদা থাকবে দৃঢ়, আচরণ থাকবে নরম। ইনশাআল্লাহ আহলেহাদীছ 'যুবসংঘে'র বিজয় কেউ ঠেকাতে পারবে না। আল্লাহ পাক যেন আমাদের সবাইকে তাঁর জান্নাতের জন্য কবুল করে নিন। আর আমাদের মা বোনদেরকে তার পথে ধরে রাখার তাওফীক দান করুন-আমীন।

'যুবসংঘে'র ছেলেদের আমার আর একটা ছোট্ট নছীহত, যা 'যুবসংঘে'র জন্মলগ্নে মাসিক রিপোর্টে বলা ছিল। সেটি হ'ল আপনার শাখায় মক্তব আছে কি না? এখন বলছি, সোনামণি মাদরাসা আছে কি না? প্রত্যেক শাখার মসজিদে একটি করে মক্তব চালু করো। 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ডে'র প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চম ক্লাসের বইগুলো সেখানে পড়াও। মানুষ বেতন দিক আর না দিক। একদিন সেটিই একেকটি 'আহলেহাদীছ আন্দোলনের' ঘাঁটিতে পরিণত হবে ইনশাআল্লাহ।

তোমাদের হাতে গড়া ঐ ছেলে যদি আগামী দিনে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টও তবুও হয়, তার আক্বীদা নষ্ট হবে না ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে আমি আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মুরুব্বী হন আর সন্তান হন সবাই মৃত্যুকে সামনে নিয়ে কাজ করুন। সেদিন জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তানের এক ভাই বসে বক্তৃতা দিতে দিতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। উর্দূ কবি বলেছেন,

'মৃত্যু আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। মৃত্যুর ঘন্টা যে কোন সময় তোমার আমার নিঃশ্বাস বন্ধ করে দিতে পারে। যে কোন সময় জীবনটা চলে যাবে'। অতএব সাবধান!

যুবকরা আমাদের প্রথম টার্গেট। যুবশক্তি আসল শক্তি। যুবক নাই তো সমাজ নাই। যুবসংঘ, সোনামণি, 'আল আওন' সবাইকে বলব, তোমরা একযোগে কাজ করে যাও। আল-'আওনকে সাধ্যমত সবাই সহযোগিতা কর।

আমরা শুধু রাফঊল ইয়াদাইন, জোরে আমীন বলার কথা বলি না। বরং সমাজের সার্বিক পরিবর্তনের জন্য কাজ করি। বিষয়গুলো আপনারা খেয়াল রাখবেন। সমাজের সর্বত্র আন্দোলন ছড়িয়ে দিবেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দ্বীনের স্বার্থে, পরকালের স্বার্থে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করার তাওফীক দান করুন-আমীন!

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড' পবিত্র কুরআন ও হাদীছ ভিত্তিক সুশৃংখল ও পরিকল্পিত শিক্ষা আন্দোলন পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি বেসরকারী ও সমন্বয়কারী শিক্ষা বোর্ড। এর মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

(১) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে শিক্ষার বিস্তার ঘটানো এবং এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষায় সুশিক্ষিত মেধাবী ও ইখলাছপূর্ণ যোগ্য আলেম ও দাঈ ইলাল্লাহ তৈরী করা এবং যুগোপযোগী মানবসম্পদে পরিণত করা।

(২) শিরক-বিদ'আত ও বাতিল আক্বীদা ও আমল থেকে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করা এবং সালাফে ছালেহীনের মানহাজ অনুযায়ী ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ময়দানে ইসলামের সঠিক শিক্ষা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য উপযুক্ত কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা।

(৩) শিক্ষার সকল স্তরে শুদ্ধভাবে কুরআন পঠন ও অনুধাবনের ব্যবস্থা করা এবং এর সাথে বাংলা, ইংরেজী, আরবী, উর্দূ ভাষাসহ মানবিক ও বিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়ন ঘটানো।

(৪) উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষক/শিক্ষিকাগণকে দক্ষতাসম্পন্ন করে গড়ে তোলা।

আপনার প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষা বোর্ড-এর অধিভুক্ত করতে কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করুন!

বোর্ড-এর কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে ব্রাউজ করুন- www.hfeb.net

সার্বিক যোগাযোগ : নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৩০-৭৫২০৫০, ০১৭২৬ ৩১৫৯৭০, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭, ই-মেইল : hf.eduboard@gmail.com, Fb page : /hf.education.board

দ্বীনী জ্ঞানের মর্যাদা

-লিলবর আল-বারাদী

(৪র্থ কিস্তি)

৮. শিশু বক্তাদের নিকট থেকে জ্ঞান আহরণে বিরত থাকা : জ্ঞান কার নিকট হ'তে গ্রহণ করা হচ্ছে, তা অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। কেননা ইলম বা জ্ঞান হ'ল দ্বীনের স্বরূপ। যেখানে দ্বীন নেই, সেখানে জ্ঞানও নেই। মুহাম্মাদ বিন সিরীন (রাঃ) বলেন, إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِيْنٌ فَانْظُرُوْا عَمَّنْ تَأْخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ 'নিশ্চয়ই এ জ্ঞান দ্বীন স্বরূপ। সুতরাং তোমরা লক্ষ্য রাখবে কার নিকট হ'তে তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করছ'।[১]

দ্বীনের নছীহত কাদের থেকে গ্রহণীয় সে সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, 'দ্বীন ইসলাম তখন নষ্ট হয়ে যাবে, যখন মানুষ ছোটদের নিকট থেকে ইলম নিবে এবং বড়দের বিরোধিতা করবে। অথচ মানুষের সংশোধন তখন হবে যখন ইলম আসবে বড়দের থেকে, আর ছোটরা তাদের অনুসরণ করবে'।[২]

আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রাঃ) বলেন, 'মানুষ ততদিন কল্যাণের ওপর থাকবে, যতদিন তাদের কাছে ইলম আসবে কিবার তথা বড়দের থেকে। যখনই তাদের কাছে ছোটদের থেকে ইলম আসবে, তখন তারা ধ্বংস হবে'।[৩] ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ (রহিঃ) বলেন,

وَقَدْ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ: أَكْثَرُ مَا يُفْسِدُ الدُّنْيَا: نِصْفٌ مُتَكَلِّمٌ وَنِصْفٌ مُتَفَقِّهٌ وَنِصْفٌ مُتَطَبِّبٌ وَنِصْفٌ نَحْوِيٌّ هَذَا يُفْسِدُ الْأَدْيَانَ وَهَذَا يُفْسِدُ الْبُلْدَانَ وَهَذَا يُفْسِدُ الْأَبْدَانَ وَهَذَا يُفْسِدُ اللِّسَانَ.

'দুনিয়াকে সবচেয়ে বেশী ধ্বংস করেছে আধা বক্তা, আধা ফাক্বীহ (আলিম), আধা ডাক্তার আর আধা ভাষাবিদ। এদের মধ্যে আধা বক্তা দ্বীনকে ধ্বংস করে, আধা ফকীহ দেশ ও জাতিকে ধ্বংস করে, আধা ডাক্তার মানুষের শরীরকে নিঃশেষ করে আর আধা ভাষাবিদ ভাষাকে বিনষ্ট করে'।[৪]

তবে শিশু বয়সে কোন কথা জেনে থাকলে তা পরবর্তীতে বর্ণনা করলে তা গ্রহণীয় হবে। কিন্তু জানার ক্ষেত্রে বর্ণনাকারীর সর্বনিম্ন বয়স পাঁচ বছর হতে হবে। মাহমূদ ইবনুর রাবী (রাঃ) বলেন, عَقَلْتُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَجَّةً مَجَّهَا فِى وَجْهِى وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ مِنْ دَلْوٍ 'আমার মনে আছে, রাসূল (ছাঃ) একবার বালতি থেকে পানি নিয়ে আমার মুখমণ্ডলে কুলি করে দিয়েছিলেন, তখন আমি ছিলাম পাঁচ বছরের বালক'।[৫]

৯. সালাফ বিদ্বানদের নিকটে জ্ঞানার্জন করা :

সালাফগণ জ্ঞানের সঠিক ধারক ও বাহক। ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) বলেন, 'প্রতিটা দলের মাঝেই হক্ব-বাতিল আছে। সুতরাং কর্তব্য হ'ল তারা যে হক্ব কথা বলবে, তাতে একমত হওয়া আর যে বাতিল কথা বলবে, তা পরিত্যাগ করা। আল্লাহ যার জন্য এ পথটুকু খুলে দিবেন, তার জন্য ইলম ও দ্বীনের সমস্ত দরজা উন্মোচিত হয়ে যাবে, এ দুইয়ের ক্ষেত্রে সকল উপকরণ সহজ করে দেওয়া হবে। আর আল্লাহ্র কাছেই সাহায্য চাই'।[৬]

বিদ'আতিদের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করা নিষেধ। শায়েখ রাবী' বিন হাদী উমাইর আল মাদখালী বলেন, الجهل أفضل من أخذ العلم عن أهل البدع، لايطلب العلم منهم ولايطلب والفطرة والقلب عليهم فوالله لأن يبقى جاهلا سليم العقل فتفسد عقيدته خير له من أن يتعلم من صاحب الهوى ويفسد منهجه. 'বিদ'আতীদের থেকে ইলম গ্রহণ করার চেয়ে অজ্ঞতা অধিক উত্তম। বিদ'আতীদের থেকে ইলম অন্বেষণ করা যাবে না এবং তাদের নিকট (জ্ঞান) চাওয়াও যাবে না। অতঃপর আল্লাহ্র শপথ! যেন জাহেল ব্যক্তির বুঝ, স্বভাব-মেজাজ এবং অন্তর (বিদআতীদের থেকে) নিরাপদ থাকে। এটা তার জন্য উত্তম। আর যে ব্যক্তি প্রবৃত্তির অনুসারী (বিদ'আতীদের) থেকে ইলম শিখবে তাহলে তার আক্বীদাহ ও মানহাজ নষ্ট হয়ে যাবে'।[৭]

১০. জ্ঞান বৃদ্ধি ও জড়তার জন্য দো'আ করা : জ্ঞান বা দ্বীনের বুঝ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বিশেষ নে'মত। এই জ্ঞানার্জনকারী একজন জ্ঞানী কখনও পরিতৃপ্তি অনুভব করতে পরেন না। সারাজীবন জ্ঞানের সন্ধানে কাটিয়ে দেন। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْهُومَانِ لاَ يَشْبَعَانِ : مَنْهُومٌ فِى الْعِلْمِ لاَ يَشْبَعُ مِنْهُ ، وَمَنْهُومٌ فِى الدُّنْيَا لاَ يَشْبَعُ مِنْهَا 'দু'জন লোভী ব্যক্তির পেট কখনো পরিতৃপ্ত হয় না। একজন জ্ঞান পিপাসু ব্যক্তি, যার পেট

---

১. *মুসলিম হা/১৪; মিশকাত হা/২৭৩; দারেমী হা/৪২৪; ছহীহ হাদীছ।*
২. *মাওসূ'আ আলবানী ফিল আক্বীদাহ ৮/১১০।*
৩. *আয-যুহদ লি ইবনিল মুবারাক, হা/৮১৫; মুছান্নাফে 'আব্দুর রাযযাক, হা/২০৪৪৬; মু'জামুল কাবীর হা/৮৫৮৯।*
৪. *মাজমূ'উ ফাতাওয়া, ৫/১১৮-১১৯।*
৫. *বুখারী হা/৭৭।*
৬. *ত্বরীকুল হিজরাতাইন, পৃঃ ৩৮৬-৮৭।*
৭. *আল ফাতওয়া ১/৩০১।*

www.tawheederdak.com

কখনও ইলম দ্বারা পরিপূর্ণ হয় না। অপরজন দুনিয়া পিপাসু ব্যক্তি, দুনিয়ার ব্যাপারে কখনও সে পরিতৃপ্ত হয় না'।[৮]

এই জ্ঞানার্জন ও দৃঢ়ভাবে ধারণের জন্য আল্লাহ্র কাছে দো'আর মাধ্যমে সাহায্য চাইতে হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا 'হে প্রভু! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও' *(ত্ব-হা ২০/১১৪)*। অন্যত্র বলেন, رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ، وَيَسِّرْ لِيْ أَمْرِيْ، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ، يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ 'হে আমার প্রভু! আমার বক্ষ প্রসারিত করে দাও' এবং আমার কর্ম সহজ করে দাও। 'আর আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও। যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে' *(ত্ব-হা ২০/২৫-২৮)*।

জ্ঞানীর পরিচয় :

তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্য মা'বুদ নেই। তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়' *(আলে ইমরান ৩/১৮)*। তিনি আরো বলেন, وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ 'পক্ষান্তরে যারা জ্ঞান ও বিদ্যায় অভিজ্ঞ তারা বলে, আমরা উহার প্রতি ঈমান এনেছি, সবই আমাদের রবের তরফ থেকে এসেছে। সত্য কথা এই যে, কোন জিনিস হতে প্রকৃত শিক্ষা কেবল জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরাই গ্রহণ করে' *(আলে ইমরান ৩/৭)*।

জ্ঞানী ব্যক্তির গুরুত্ব :

জ্ঞানী ব্যক্তি সর্বদা সম্মানিত। জ্ঞানীর মর্যাদা বা গুরুত্ব অপরিসীম। জ্ঞানীরা সমাজের প্রাণ। এদের মাধ্যমে প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয় এবং কোন প্রকার ক্ষতির আশংকা থাকে না। আল্লাহ তা'আলা জ্ঞানীর মর্যাদা সম্পর্কে বলেন, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُو الْأَلْبَابِ 'বল, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান? কেবলমাত্র জ্ঞানীরাই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে' *(যুমার ৩৯/৯)*। আর প্রকৃত জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ সর্বত্র সম্মানিত হবেন। আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى 'তোমাদের মধ্যে জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিগণই আমার নিকটবর্তী হয়ে দাঁড়াবেন'।[৯]

জ্ঞানী ব্যক্তির মৃত্যুর মাধ্যমে ইলম তথা দ্বীনের সঠিক জ্ঞানের বিলুপ্তি ঘটবে এবং মূর্খতা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পাবে। আর এর জ্ঞানীরা না থাকলে দুনিয়ার শেষ ঘণ্টা বেজে যাবে এবং ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ، 'ক্বিয়ামতের অন্যতম নিদর্শন হ'ল ইলম উঠিয়ে নেয়া হবে ও মূর্খতা বেড়ে যাবে'।[১০] আল্লাহ মানুষের ক্বলব থেকে ইলম ছিনিয়ে নেবেন। জ্ঞানী ব্যক্তিকে উঠিয়ে নিবেন এবং মূর্খরা সমাজে নেতৃত্ব দিবে ও বিশৃংখলা ছড়াবে। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. 'নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়ার মাধ্যমে ইলম তুলে নিবেন না। বরং আলেমদেরকে উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নিবেন। অবশেষে যখন একজন আলেমকেও তিনি জীবিত রাখবেন না, তখন লোকেরা মূর্খ নেতাদের গ্রহণ করবে। অতঃপর তারা জিজ্ঞাসিত হবে। তখন না জেনেই ফৎওয়া দিবে। এভাবে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে'।[১১]

সুতরাং সমাজে জ্ঞানী ব্যক্তিদের লালন ও দ্বীনের বিশুদ্ধ জ্ঞান সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়া উচিৎ। জ্ঞানীরা নবী (ছাঃ)-এর ওয়ারিছ এবং সাধারণ মানুষের উপরে জ্ঞানীর মর্যাদা'।[১২] প্রকৃত জ্ঞানীরা জ্ঞানের গগণে নক্ষত্রের মত চিরোজ্জ্বল। আবু মুসলিম আল-খাওলানি বলেন, 'পৃথিবীর বুকে আলেমদের উদাহরণ হ'ল আকাশের তারাদের মতন, যতক্ষণ তাদের উপস্থিতি থাকে, মানুষ দিকনির্দেশনা পায়; কিন্তু যখন তারা অন্তরালে চলে যান, মানুষ দিশেহারা হয়ে যায় ও পথভ্রষ্ট হয়'।[১৩]

জ্ঞানী ও সাধারণ ব্যক্তির পার্থক্য :

ইলম আল্লাহ প্রদত্ত এক অফুরন্ত নে'মত, যা জ্ঞানী ও মূর্খদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। ইলম বা জ্ঞানকে আলোর সাথে তুলনা করা হয়েছে। অন্যদিকে অজ্ঞতাকে অন্ধকারের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ 'যে ব্যক্তি জানে যে, যা কিছু পালনকর্তার পক্ষ থেকে আপনার উপর নাযিল করা হয়েছে তা সত্য, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান যে অন্ধ? তারাই বোঝে যারা বোধশক্তিসম্পন্ন' *(রা'দ ১৩/১৯)* অন্যত্র বলেন, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيْرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّوْرُ. 'বল, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান অথবা অন্ধকার ও আলো কি এক?' *(রা'দ ১৩/১৬)*। এ

---

৮. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, দারেমী হা/৩৩১; হাসান, মিশকাত হা/২৬০ সদন ছহীহ।*
৯. *মুসলিম হা/৪৩২; মিশকাত হা/১০৮৯।*
১০. *বুখারী হা/৮০; মুসলিম হা/২৬৭১; মিশকাত হা/৫৪৩৭।*
১১. *বুখারী হা/১০০; মুসলিম হা/২৬৭৩; মিশকাত হা/২০৬।*
১২. *তিরমিযী হা/২৬৮৫; মিশকাত হা/২১৩, ২১৪; ছহীহুল জামি' হা/৪২১৩।*
১৩. *আল-বায়হাকী, আল-মাদখাল ইলা আল-সুনান আল-কুবরা, ২৮৭।*

আয়াত থেকে বুঝা যায় অন্ধ ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তির মধ্যে যেমন পার্থক্য রয়েছে, তেমনি জ্ঞানী ও জ্ঞানহীন ব্যক্তির মধ্যেও রয়েছে ব্যাপক তফাৎ। একজন ইবাদতকারীর চেয়ে একজন জ্ঞানীর মর্যাদা অনেক উপরে। কারণ সাধারণ আবেদ ব্যক্তি দ্বীনের যথেষ্ট জ্ঞান রাখে না; কিন্তু আলেম দ্বীনের যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন এবং তা জীবনে প্রতিপালন করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِيْ عَلَى أَدْنَى مِنْ أُمَّتِـــيْ 'আবেদের উপরে আলেমের মর্যাদা হচ্ছে তোমাদের মধ্যে নিম্নতমের উপরে যেমন আমার মর্যাদা'।[১৪] কারণ আলেম সমাজ সবচেয়ে বেশী আল্লাহকে ভয় করেন মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَـــاءُ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে আলেমরাই তাঁকে বেশী ভয় করে' *(ফাত্বির ৩৫/৮)*।

একজন মূর্খ ব্যক্তি চিন্তাভাবনা ছাড়াই কথা বলে, পক্ষান্তরে একজন প্রকৃত জ্ঞানী চিন্তাভাবনা করে কথা বলে এবং জিহ্বাকে সংযত রাখে। প্রখ্যাত তাবিঈ ইমাম হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, 'বুদ্ধিমান ব্যক্তির জিহ্বা তার হৃদয়ের পেছনে থাকে; সে যখন কথা বলতে চায়, প্রথমে সে চিন্তা করে। যদি শব্দগুলো তার জন্য কল্যাণকর হয় তাহ'লে সে তা বলে। আর যদি কথাগুলো তার জন্য অকল্যাণকর হয় তাহ'লে সে চুপ থাকে। কিন্তু একজন মূর্খ ব্যক্তির জিহ্বা তার হৃদয়ের সামনে থাকে; সে কথা বলার সময় খুব কমই চিন্তা করে এবং তার জন্য কল্যাণকর বা অকল্যাণকর হোক যাচাই না করে সে বলে ফেলে'। অন্যত্র বলেন, 'অজ্ঞ আমলকারী পথহারা পথিকের ন্যায়। সে কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বেশী করে। অতএব তুমি জ্ঞানার্জন কর এমনভাবে যাতে তা ইবাদতকে ক্ষতিগ্রস্থ না করে, আবার ইবাদত কর এমনভাবে যেন তা জ্ঞানার্জনকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে। একদল লোক এমনভাবে ইবাদতে ডুবে থাকে যে তারা জ্ঞানার্জনের সুযোগ পায় না, অথচ তারা উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর তরবারী চালিয়ে দেয়। যদি জ্ঞান থাকত তাহলে তারা এরূপ কর্মে লিপ্ত হতে পারত না'। শুধুমাত্র আমলকারীর চেয়ে জ্ঞানীর শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য চিরকাল।

জ্ঞানীদের করণীয় ও বর্জনীয় :

জ্ঞানী ব্যক্তি সর্বদা সর্বক্ষেত্রে দ্বীনের ওপর অবিচল থাকবেন অর্থাৎ কুরআন সুন্নাহ কর্তৃক যা আদিষ্ট হয়েছে তা প্রতিপালন করবেন এবং যাতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে তা থেকে বেঁচে থাকবেন। আর এজন্য দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা স্বরূপ।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ. 'দুনিয়া মুমিনের জন্য কারাগার ও কাফেরের জন্য জান্নাত'।[১৫]

১৪. *তিরমিযী হা/২৬৮৫; মিশকাত হা/২১৩, ২১৪; ছহীহুল জামি' হা/৪২১৩।*
১৫. *মুসলিম হা/২৯৫৬; মিশকাত হা/৫১৫৮।*

দুনিয়াতে জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা দ্বীনের গণ্ডির মধ্যে আবর্তিত হয়। কিন্তু আখিরাতে কল্পনাতীত জান্নাত অর্জন করে সেখানে রাজত্ব করবেন। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেন, الدنيا سجن المؤمن، وأعظم أعماله في السجن الصبر وكظم الغيظ، وليس للمؤمن في الدنيا دولة، وإنما دولته في الآخرة، 'দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা স্বরূপ। আর এই জেলখানাতে তার সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে ধৈর্য ধারণ করা এবং ক্রোধ দমন করা। দুনিয়াতে মুমিনের কোন রাজত্ব নেই। প্রকৃতপক্ষে তার রাজত্ব কায়েম হবে আখেরাতে'।[১৬] এই জন্য দুনিয়াতে জ্ঞানীরা কুরআন সুন্নাহ্র প্রকৃত অনুসারী হবেন এবং যাবতীয় বর্জনীয় বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করে চলবেন।

ক. জ্ঞানী ব্যক্তির যা করণীয় :

১. দ্বীনের সঠিক জ্ঞানার্জন করা :

যে প্রকৃত জ্ঞানী হতে আকাংখিত সে যেন সর্বপ্রথম দ্বীনের সঠিক জ্ঞান তথা কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ সম্পর্কে বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করা উচিৎ। ইমাম বুখারী (রহঃ) ছহীহ বুখারীতে 'কথা ও কাজের পূর্বে জ্ঞান অর্জন করা' শিরোনামে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন।[১৭] জ্ঞানী হতে গেলে অবশ্যই দ্বীনের সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে হয়। আবু দারদা (রাঃ) বলেন, 'কোন মানুষ জ্ঞানী হয়ে জন্ম নেয় না। তাকে জ্ঞান অর্জন করতে হয়'।[১৮]

আমাদের রাসূল (ছাঃ) অক্ষরজ্ঞানহীন ছিলেন। কিন্তু তবুও তিনি শিক্ষাগ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা জিব্রীল (আঃ)-কে পাঠিয়ে যে শিক্ষা দিয়েছিলেন তা হ'ল 'পড়'। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ- خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ- اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ- الَّـــذِيْ عَلَّـــمَ بِالْقَلَمِ- عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَـــمْ. 'পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। পড় এবং তোমার প্রতিপালক মহা সম্মানিত। যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন। যিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না' *(আলাক্ব ৯৬/১-৫)*।

দুনিয়ার জীবনে অহীর জ্ঞানার্জন করা ফরয। আর আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ 'প্রত্যেক মুসলিমের উপর দ্বীনী ইলম (অহীর জ্ঞান) শিক্ষা করা ফরয'।[১৯]

সঠিক জ্ঞান ব্যতীত মানুষ গোমরাহীতে নিপতিত হবে। সঠিক জ্ঞান মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শন করায় এবং হক্ব বলতে ও মানতে সাহায্য করে। দ্বীন প্রতিপালনের পূর্বে জেনে বুঝে

১৬. *আব্দুল ওয়াহ্হাব শা'রানী, তাম্বীহুল মুগতাররীন, পৃ. ১০৯।*
১৭. *বুখারী পৃঃ ১৬।*
১৮. *কিতাবুল ইলম, ইবনে খায়ছামাহ, পৃঃ ২৮।*
১৯. *ইবনু মাজাহ হা/২২৪; মিশকাত হা/২১৮; ছহীহুল জামি' হা/৩৯১৩; ছহীহ হাদীছ।*

জ্ঞানার্জন করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ 'সুতরাং জেনে রাখো, আল্লাহ ছাড়া (সত্য) কোন ইলাহ নেই' *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৯)*। 'জেনে রাখো' বাক্য দ্বারা আল্লাহ তা'আলা 'ইলম শিক্ষা বা জ্ঞানার্জনের' কথা বলেছেন।

বিশুদ্ধ ইলম অর্জনের নির্দেশনা স্বরূপ আল্লাহ সুবহানা ওয়া তা'আলা জ্ঞানীদের নিকটে অজানা বিষয় জেনে নিতে বলেছেন, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ 'সুতরাং জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করো যদি তোমরা না জান' *(আন-নাহল ১৬/৪৩)*।

মানুষের দেহের রোগের চেয়ে আত্মার ব্যাধি অতীব মারাত্মক হয়। আর এর চিকিৎসা প্রকৃত জ্ঞানীদের নিকটে মিলে, যখন তাদেরকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ 'নিশ্চয়ই অজ্ঞতার চিকিৎসা হ'ল জিজ্ঞাসা'।[২০] এই জন্য জেনে বুঝে সঠিকটা গ্রহণ করতে হয়, যাতে আত্মা প্রশান্তি অনুভব করে। হযরত আবি ছা'আলাবা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الْبِرُّ مَا سَكَنَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالإِثْمُ مَا لَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَلَمْ يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ 'সৎ কর্মে আত্মা প্রশান্ত থাকে এবং অন্তর থাকে ধীরস্থির। আর গুণাহের কাজে আত্মা প্রশান্ত থাকে না এবং অন্তরও ধীরস্থির থাকে না। যদিও মুফতিগণ সে বিষয়ে তোমাকে ফতওয়া প্রদান করেন'।[২১]

আর বিশুদ্ধ ইলম অর্জনে কোন বয়সসীমা নেই। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জ্ঞানার্জন করতে হবে। হাসান বিন মানছূর আল-জাচ্ছাছ বলেন, আমি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কত বছর পর্যন্ত একজন মানুষ লেখাপড়া শিখবে? তিনি বললেন, মৃত্যু পর্যন্ত।[২২]

আর এরাই উত্তম ব্যক্তি যারা দ্বীন শিখে, পালন করে এবং অপরের নিকটে পৌঁছে দেয় বা অন্যকে শিক্ষা দেয়। ওছমান (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ 'তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম যে কুরআন শিখে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়'।[২৩]

একজন ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে সহনশীলতার ক্ষমতা ও কল্যাণ লাভ করে থাকে। আবু দারদা (রাঃ) বলেন, 'জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে উপার্জিত হয় ধৈর্যধারণের ক্ষমতা। যে ব্যক্তি কল্যাণের খোঁজে ব্যস্ত হয়, সে কল্যাণই অর্জন করে। আর যে ব্যক্তি অকল্যাণ থেকে বাঁচার চেষ্টা করে, সে অকল্যাণ থেকে রক্ষা পায়'।[২৪] অন্যত্র মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) বলেন, 'তোমরা জ্ঞানার্জন কর। কেননা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে জ্ঞানার্জনের অর্থ তাঁকে ভয় করা। জ্ঞানের আকাংখা করা ইবাদত। জ্ঞান চর্চা করা হ'ল তাসবীহ। জ্ঞানের অনুসন্ধানও জিহাদ করা। অজ্ঞ ব্যক্তিকে জ্ঞান দেওয়া ছাদাকাহ। উপযুক্ত ক্ষেত্রে তা ব্যয় করা আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জনের যথার্থ মাধ্যম। আর তা হালাল-হারাম জানার মানদণ্ড, একাকিত্বের বন্ধু, নিঃসঙ্গতার সঙ্গী, সুখ-দুঃখের ধ্রুবক, চরিত্রের সৌন্দর্য, অপরিচিতের সাথে পরিচিত হওয়ার মাধ্যম। আল্লাহ জ্ঞানের দ্বারা মানুষকে এমন মর্যাদাবান করেন, যা স্থায়ীভাবে তাকে অনুসরণীয় করে রাখে'।[২৫]

সম্পদশালী হওয়ার চেয়েও জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে পাণ্ডিত্য অর্জন করা উত্তম। জ্ঞান ও অর্থ-সম্পদের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে আলী (রাঃ) বলেন, 'জ্ঞান অর্থ-সম্পদের চেয়ে উত্তম। কেননা জ্ঞান তোমাকেই পাহারা দেয় কিন্তু অর্থকে পাহারা দিতে হয়। অথচ জ্ঞান হ'ল শাসক, আর অর্থ হ'ল শাসিত। অর্থ ব্যয় করলে নিঃশেষ হয়ে যায়, কিন্তু জ্ঞান বিতরণ করলে আরও বৃদ্ধি পায়'।[২৬]

২. তাক্বওয়াশীল হওয়া :

তাক্বওয়াশীল ব্যক্তি জ্ঞানীদের মধ্যে শামিল হ'লে তাঁর কথা ও কাজে আল্লাহ বারাকাহ দান করেন। দ্বীনের দাওয়াত প্রসারে অতিব দ্রুত ফলপ্রসূ হয়। তাক্বওয়াই হ'ল প্রকৃত ইলম। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলতে শুনেছি, وَمِلَاكُ الدِّينِ الْوَرَعُ. 'দ্বীনের মূল হ'ল তাক্বওয়া'।[২৭]

ইবনু কাছীর বলেন, তাক্বওয়ার মূল অর্থ হ'ল التوقي ما يكره 'অপসন্দনীয় বিষয় থেকে বেঁচে থাকা'। অর্থাৎ দ্বীন পালনের ব্যাপারে তাওহীদ-শিরক, সুন্নাত-বিদ'আত, হালাল-হারাম, সত্য-মিথ্যা প্রভৃতি বিষয়ে দ্বীনের মৌলিক জ্ঞান অর্জন করা।

একজন জ্ঞানীর প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হ'ল তিনি আল্লাহভীরু হবেন। আল্লাহভীতি ছাড়া পাহাড় পরিমাণ জ্ঞান কোনই কাজে আসবে না। আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ 'আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে মূলতঃ জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করে' *(ফাতির ৩৫/২৮)*। বেশী বেশী হাদীছ জানা ও তা মানা একজন জ্ঞানীর তাক্বওয়ার মানদণ্ড। আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) বলেন, لَيْسَ الْعِلْمُ بِكَثْرَةِ الرِّوَايَةِ، إِنَّمَا الْعِلْمُ الْخَشْيَةُ 'অধিক হাদীছ জানাই প্রকৃত জ্ঞানার্জন নয়। বরং প্রকৃত জ্ঞানার্জন হ'ল আল্লাহভীতি অর্জন করা'।[২৮] আমলহীন ইলম কোন কাজে আসে না, যদিও সে পর্বতের মত জ্ঞানী হয়। জনৈক

---

২০. *আবূ দাঊদ হা/৩৩৬; মিশকাত হা/৫৩১; দারাকুৎনী হা/৭৪৪; ছহীহুল জামি' হা/৪৩৬২; হাসান ছহীহ।*
২১. *ছহীহুল জামি' হা/২৮৮১*
২২. *ত্বাবাকাতুল হানাবিলাহ ১/১৪০।*
২৩. *মিশকাত হা/২১০৯*
২৪. *কিতাবুল ইলম, ইবনে খায়ছামাহ, পৃঃ ২৮।*
২৫. *আল-আজুরী, আখলাকুল ওলামা, পৃঃ ৩৪-৩৫।*
২৬. *ইমাম গাযযালী, ইহয়াউল উলূম, ১/১৭-১৮।*
২৭. *মিশকাত হা/২৫৫; ছহীহুল জামি' হা/১৭২৭; সনদ ছহীহ।*
২৮. *ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ফাওয়ায়েদ, ১৪৭ পৃঃ।*

আরবী কবি বলেন, لو كان للعلم شرف من دون التقـــي* لكان أشرف خلق الله إبلـــيس ‘যদি তাক্বওয়াবিহীন ইলমের কোন মর্যাদা থাকত, তবে ইবলীস আল্লাহ্র সৃষ্টিকুলের সেরা বলে গণ্য হ’ত।[২৯] আবু যার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে বলেছেন, إِنَّكَ لَسْتَ بِخَيْرٍ مِنْ أَحْمَرَ وَلَا أَسْوَدَ إِلَّا أَنْ تَفْضُـــلَهُ بِتَقْـــوَى ‘তুমি লাল বর্ণ বা কালো বর্ণ বিশিষ্ট হলেই উত্তম হবে না; বরং আল্লাহভীতি দ্বারাই তুমি শ্রেষ্ঠ হবে’।[৩০]

সাহল ইবনু আব্দুল্লাহ বলেন, ‘যখন কোন মুমিন...তাক্বওয়া অবলম্বন করবে, তখন তার অন্তর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে যুক্ত হবে’।[৩১]

৩. বিশুদ্ধ ইলম অনুযায়ী আমল করা :

দুনিয়াবী জীবনে দ্বীন পালনের ব্যাপারে তাওহীদ-শিরক, সুন্নাত-বিদ‘আত, হালাল-হারাম, সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় ভালো-মন্দ প্রভৃতি বিষয়ে দ্বীনের মৌলিক জ্ঞান অর্জন করে সঠিক গ্রহণ এবং যা বাতিল তা বর্জন করা। অহীর জ্ঞানার্জন ও বিশুদ্ধ আমলের মাধ্যমে একজন মানুষ সুশিক্ষিত হিসাবে গড়ে উঠে। আর সুশিক্ষা মানুষকে বিবেকবান ও অধিক তাক্বওয়াশীল করে।

ইলমের অপর নাম তাক্বওয়া। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলতে শুনেছি, -وَمِلَاكُ الدِّينِ الْوَرَعُ ‘দ্বীনের মূল হ’ল তাক্বওয়া’।[৩২] আবার তাক্বওয়ার সাথে সম্পূরক হ’ল ইবাদত। ইলম অর্জন যেমন ফরয তেমনি তদানুসারে আমল করা ওয়াজিব। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন, وما العلم إلا العمل به والعمل به ترك العاجل للآجل ‘ইলম হচ্ছে আমলের নাম। আর আমল হ’ল স্থায়ী জগতের স্বার্থে ক্ষণস্থায়ী জগত পরিহার করা’।[৩৩] অন্যত্র সাহল ইবনু আব্দুল্লাহ বলেন, ‘যখন কোন মুমিন তার ইলম অনুযায়ী আমল করবে, তখন তার ইলম তাকে তাক্বওয়া ও পরহেযগারিতার দিকে পথ প্রদর্শন করবে’।[৩৪]

রাসূল (ছাঃ) যে দ্বীন নিয়ে এসেছেন তা যথাসাধ্য রপ্ত করা ও জীবনে প্রতিপালন করা। অর্থাৎ- আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) যে সকল বিষয়ে আদেশ-নিষেধ করেছেন, সেসব বিষয় সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানর্জন করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا، ‘আর রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা হ’তে বিরত থাক’ *(হাশর ৫৯/৭)*।

ইলম অর্জনের যে চারটি ধাপ রয়েছে তন্মধ্যে তৃতীয় ধাপ হ’ল ইলম অনুসারে আমল করে তা নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠা করা। সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন, ইলম অর্জনের পরে ইলম অনুযায়ী আমল করা’।[৩৫]

ইলম অর্জন করা যত কঠিন তদানুযায়ী আমল করা তার চেয়ে অধিক কঠিন। হিলাল ইবনুল আ‘লা (রহঃ) বলেন, ‘ইলম অর্জন করা কঠিন কাজ। এর চেয়ে কঠিন কাজ ইলম সংরক্ষণ করা। আর তার চেয়েও অনেক কঠিন কাজ ইলম অনুযায়ী আমল করা’।[৩৬]

ইলম অনুযায়ী আমল না করলে ক্বিয়ামতের মাঠে কঠিন জবাবদিহি করতে হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে হবে। উসামা ইবনু যায়দ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘ক্বিয়ামতের দিন জনৈক ব্যক্তিকে আনা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আগুনে তার নাড়ী-ভূড়ি বেরিয়ে যাবে। তখন সে ঐ নাড়ী-ভূড়ির চতুর্দিকে ঘুরতে থাকবে। যেমনভাবে গাধা ঘানির চারদিকে ঘুরে থাকে। এ অবস্থা দেখে জাহান্নামবাসীরা তার চারপাশে জড়ো হবে ও তাকে লক্ষ্য করে বলবে, أَيْ فُلَانُ مَا شَأْنُكَ؟ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ؟ ‘হে অমুক! তোমার এ কি অবস্থা? তুমি না সর্বদা আমাদেরকে ভাল কাজের উপদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতে? তখন লোকটি জবাবে বলবে, كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ ‘আমি তোমাদেরকে ভাল কাজের আদেশ দিতাম; কিন্তু নিজে তা করতাম না। আমি তোমাদেরকে মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতাম; কিন্তু আমি নিজেই সে কাজ করতাম’।[৩৭]

প্রত্যেকের উচিৎ সাধ্যমত জ্ঞানার্জন করে তদানুযায় আমল করা। আর তা না করলে ক্বিয়ামতের মাঠে নিঃস্ব ও আমানতের খেয়ানতকারী হিসেবে উঠবে। ইবনুল জাওযী (৫০৮-৫৯৭ হি.) বলেন, الْمِسْكِينُ كُلُّ الْمِسْكِيْنِ مَنْ ضَاعَ عُمْرُهُ فِي عِلْمٍ لَمْ يَعْمَلْ بِهِ، فَفَاتَتْهُ لَذَّاتُ الدُّنْيَا وَخَيْرَاتُ الآخِرَةِ، فَقَدِمَ مُفْلِسًا عَلَى قُوَّةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ ‘সব মিসকীনের বড় মিসকীন সেই, যে তার সারাটা জীবন ব্যয় করল জ্ঞানের অন্বেষণে। অথচ সে অনুযায়ী আমল করল না। ফলে সে দুনিয়াবী সুখ থেকে বঞ্চিত হ’ল এবং আখেরাতের কল্যাণ সমূহ থেকেও বঞ্চিত হ’ল। অতঃপর নিজের বিরুদ্ধে শক্তিশালী সাক্ষ্যের বোঝা নিয়ে সে নিঃস্ব অবস্থায় হাশরের ময়দানে উপস্থিত হ’ল’।[৩৮] *(ক্রমশঃ)*

[লেখক : যশপুর, তানোর, রাজশাহী]

---

২৯. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, নবীদের কাহিনী, ১/১৩।*
৩০. *আহমাদ, মিশকাত হা/৫১৯৮।*
৩১. *হিলয়াতুল আউলিয়া ১০/২০৫।*
৩২. *মিশকাত হা/২৫৫; ছহীহুল জামি‘ হা/১৭২৭; সনদ ছহীহ।*
৩৩. *আল মাদখাল লিল বায়হাক্বী, হা/৪৭৫।*
৩৪. *হিলয়াতুল আউলিয়া ১০/২০৫।*
৩৫. *হিলয়াতুল আউলিয়া ৬/৩৬২।*
৩৬. *ইমাম যাহাবী, আল কাবাইর, পৃষ্ঠা-৭৬।*
৩৭. *মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/৫১৩৯, ‘সৎ কাজের নির্দেশ’ অনুচ্ছেদ।*
৩৮. *ইবনুল জাওযী, ছায়দুল খাত্বের ১৫৯ পৃ.।*

শতাব্দীর সূর্য মাওলানা আকরম খাঁ

- মুহাম্মাদ আবু হুরায়রা ছিফাত

ভূমিকা :

১৭৫৭ সালে পলাশী বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের কাঠামোগত বিপর্যয়ের সূচনা হয়। ধীরে ধীরে ক্ষমতা বলয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে চেপে বসে ব্রিটিশ বেনিয়ারা। ক্ষমতা দখলকে কেন্দ্র করে উপমহাদেশীয় মুসলিমদের সাথে ব্রিটিশদের যে তিক্ততা, তা আরো তীব্র রূপ নেয় সিপাহী বিদ্রোহ ও ওহাবী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। মুসলিমরা আশরাফ শ্রেণী থেকে রাতারাতি দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হয়, আর সেই স্থান দখল করে হিন্দুরা। প্রশাসনিক কার্যক্রমে আরবী-ফারসীর ব্যবহার অপসারণের ফলে মুসলিমরা অশিক্ষিত এক শ্রেণী হিসাবে পরিগণিত হ'তে থাকে। ব্রিটিশ আমলে ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দুদের নামের সাথে 'বাবু' শব্দটি জুড়ে দেওয়া হতো। আর তৎকালীন কলকাতা কেন্দ্রীক হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের বলা হ'ত 'বাবু বুদ্ধিজীবী', এরা ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের উদরে পুষ্ট হওয়া একটি গোষ্ঠী।

ব্রিটিশদের আগ্রাসনের প্রধান শিকার ছিল মুসলিম বাংলা। তাদের অত্যাচার, নির্যাতন, ধর-পাকড় এবং অবহেলার ফলে বাঙালি মুসলিমরা শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি সবকিছুতেই কেবল পিছু হটতে থাকে। এ সময় হিন্দুরা মুসলিমদের 'মুছলমানের ব্যাটা-ম্লেচ্ছ-যবন-ছোটলোক-চাষা' ইত্যাদি বলে তাচ্ছিল্য করতো এবং বলে রাখা ভালো, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না।

শাসকগোষ্ঠী এবং রাতারাতি মুসলিমদের জমিদারি হাতে পাওয়া হিন্দুদের হিংসা-প্রতিহিংসা, অবহেলা ও নিপীড়নে যখন মুসলিমরা কালাতিপাত করছিল এমনই এক ঐতিহাসিক কালপর্বে আগমন করেন শতাব্দীর সূর্য মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ। মুসলিমদের বিশেষত বাঙালি মুসলিমদের অধিকার আদায়ের পক্ষে, তাদের শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে এবং তাদের স্বাধীনতার জন্য তিনি অবিরাম সংগ্রাম করেন। আত্মপরিচয় ও সংস্কৃতিক সংকটে ভোগা মুসলিম সমাজকে তিনি চিনিয়ে দেন তাদের সত্যিকারের পরিচয়-সংস্কৃতি। এক শতাব্দী কাল ধরে তিনি মুসলিম সমাজের রাজনীতি, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও বুদ্ধিবৃত্তির সাথে জড়িয়ে যান অঙ্গাঙ্গিভাবে। অত্র প্রবন্ধে এই মহান কিংবদন্তীর দীর্ঘ ও সংগ্রামী জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত উল্লেখ করা হ'ল।

জন্ম ও বংশপরিচয় :

১৮৬৮ সালের ৭ই জুন (মতান্তরে ৮ই জুন), পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশপরগনা জেলার হাকিমপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত, আলিম ও মুজাহিদ পরিবারে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মাওলানা আব্দুল বারী খাঁ, মাতা রাবেতা খাতুন। পিতা মাওলানা আব্দুল বারী খাঁ ছিলেন শাইখুল কুল ফিল কুল মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর এক কৃতি ছাত্র এবং তার নানা হাজী মুফিযুদ্দীন ছিলেন মাওলানা এনায়েত আলীর প্রতিষ্ঠিত হাকিমপুর কেন্দ্রের অন্যতম প্রধান সহযোগী'।[১]

১৮৩১ সালে বালাকোটের যুদ্ধে তার পূর্বপুরুষদের একজন শহীদের মর্যাদা লাভ করে।[২] তাঁর পিতাও বালাকোটের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে 'গাযী' উপাধিতে ভূষিত হন'।[৩] সাইয়্যেদ নিছার আলী তিতুমীরের বিখ্যাত বাঁশের কেল্লা ছিল আকরম খাঁর পাশের গ্রামে'।[৪] আকরম খাঁর পিতামহ তোরাব আলী খাঁ ছিলেন শহীদ তিতুমীরের সহযোদ্ধা'।[৫] আকরম খাঁর পূর্বপুরুষরা ছিলেন ব্রাহ্মণ। ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পনেরো শতকে তারা ইসলাম গ্রহণ করেন'।[৬] জনশ্রুতি আছে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন এক পূর্বপুরুষ এবং আকরম খাঁর জনৈক পূর্বপুরুষ ছিলেন সহোদর ভাই'।[৭]

শিক্ষা জীবন :

এগারো বছর বয়সে একই দিনে পিতা-মাতা উভয়কে হারিয়ে আকরম খাঁ নানার কাছে মানুষ হন'।[৮] পারিবারিক ঐতিহ্য অনুযায়ী বাড়িতেই তিনি আরবী-ফার্সী শিক্ষা গ্রহণ করেন'।[৯] এছাড়া গ্রামের মক্তবেও তিনি লেখাপড়া করেছেন। ইসলামী শিক্ষার প্রতি অনুরাগ ও ইংরেজী শিক্ষার প্রতি বিরাগবশত ইংরেজী স্কুল ছেড়ে তিনি ১৮৯৬ সালে কলিকাতা মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং ১৯০১ সালে তিনি এফ. এম (ফাইনাল মাদ্রাসা) পাস করেন'।[১০] এছাড়া আকরম খাঁ নিজ প্রচেষ্টায় বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন।

---

১. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আহলেহাদীছ আন্দোলন (হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় প্রকাশ : জানুয়ারী ২০১১), পৃ. ৪৬৭।*
২. *ড. আবুল কালাম মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর অবদান (বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ : জুন ২০০৯) পৃ. ০৪-০৫*
৩. *ফাহমিদ-উর-রহমান, উত্তর আধুনিক মুসলিম মন (বাংলা সাহিত্য পরিষদ, প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০১০), পৃ. ২৬*
৪. *মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর অবদান, পৃ. ০৪-০৫।*
৫. *ইমরান মাহফুজ, কালান্তরের অভিযাত্রী (ঐতিহ্য, প্রকাশকাল : জুন ২০২১), পৃ. ১২৬; উত্তর আধুনিক মুসলিম মন, পৃ. ২৬।*
৬. *কালান্তরের অভিযাত্রী, পৃ. ১২৭।*
৭. *উত্তর আধুনিক মুসলিম মন, পৃ. ২৬*
৮. *আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃ. ৪৬৭।*
৯. *মাসিক আত-তাহরীক, সেপ্টেম্বর ২০২০, 'মুসলিম সমাজ ও মাওলানা আকরম খাঁ', পৃ. ০৩।*
১০. *ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা (ইসলামিক ফাউন্ডেশন, তৃতীয় সংস্করণ: ফেব্রুয়ারী ২০০৯), পৃ. ২৫২।*

ইসলামী চিন্তা-ভাবনা :

মাওলানা আকরম খাঁ ছিলেন ওহাবী পরিবারের সন্তান। উনার বাপ-দাদা ও নানা জিহাদ আন্দোলনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। পারিবারিক উত্তরাধিকার সূত্রেই জিহাদী জোশ তাঁর রক্তে মিশে ছিল। মাওলানা আকরম খাঁ নির্দিষ্ট কোনো মাযহাবের অনুসরণ করতেন না। তিনি একজন আহলেহাদীছ আলেম হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তাকলীদের বিরুদ্ধে ছিলেন আপোসহীন'।[১১] দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বলেন, 'কেবল অশিক্ষিত মানুষেরা ধর্মের শাসন-অনুশাসনের ক্ষেত্রে চার ইমামের মাযহাবকে শেষ ব্যাখ্যা মনে করে তাক্বলীদের দ্বার চিরতরে অবরুদ্ধ ভেবে এ ক্ষেত্রে টু শব্দটি করার স্বাধীনতা খুঁজে পাচ্ছে না। তাই প্রথমে গোড়ার দিকে সংস্কার করার বাসনায় তিনি হাদীছ শাস্ত্র ঘেঁটে মাল-মসলা সংগ্রহ করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন, কুরআন ও হাদীছের সূত্রগুলোর ব্যাখ্যা করার স্বাধীনতা সকল মুসলমানের রয়েছে। এক্ষেত্রে তার সহযাত্রী ছিলেন মাওলানা আব্দুল্লাহেল বাকী। এদেরই চেষ্টায় এ অঞ্চলে আহলে হাদীছ আন্দোলন বিশেষভাবে ফলে ওঠে'।[১২]

মাওলানা ছিলেন প্যান ইসলামী ধারণায় বিশ্বাসী'।[১৩] শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ) ও মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব (রহঃ)-এর দ্বারা তিনি প্রভাবিত ছিলেন। তিনি শিরক-বিদ'আত এবং পীর-ফকির ও ভ্রান্ত ছূফীদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। তিনি আহলে হাদীছদের আদর্শে মুসলিম সমাজকে গড়তে চেয়েছিলেন। এজন্য বিভিন্ন জনের দ্বারা তিনি আক্রান্ত ও সমালোচিত হয়েছিলেন'।[১৪]

মাওলানা আকরম খাঁ 'ইসলাম মিশন', 'খাদিমুল ইসলাম' এর মতো ধর্মীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠায়ও ভূমিকা রাখেন। এ অঞ্চলে তিনি হানাফী-আহলেহাদীছ দ্বন্দ্ব নিরসন করে উভয় জামা'আত মিলে গঠনমূলক কাজ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ লক্ষ্যে মাওলানা আকরম খাঁ, মাওলানা আব্দুল্লাহেল বাকী, মাওলানা এছলামাবাদী ও ড. শহীদুল্লাহ্‌র মিলিত প্রচেষ্টায় ১৯১৩ সালে বগুড়ার বানিয়া গ্রামে 'আঞ্জুমান-এ-উলামা-এ-বাংলা' প্রতিষ্ঠা করেন। এর সভাপতি ছিলেন আব্দুল্লাহেল বাকী, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ও মাওলানা আকরম খাঁ ছিলেন যথাক্রমে এর ভাইস প্রেসিডেন্ট ও জেনারেল সেক্রেটারী'।[১৫]

সে সময়ে বাংলার মুসলিম সমাজে 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন' নামে এক নব্য ফিৎনা মাথাচাড়া দেয়। কাজী আব্দুল ওদুদ, নাসিরউদ্দীন প্রমুখরা তখন প্রগতির নামে, বুদ্ধির মুক্তির নামে ইউরোপীয় এনলাইটেনমেন্টকেই (Enlightenment) মানব মুক্তির পথ ধরে নিয়ে 'সওগাত' এবং 'শিখা গোষ্ঠী' প্রতিষ্ঠা করে, মুসলিম সমাজকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চক্রান্ত করে। আকরম খাঁ তাদের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ করেন, কলম ধরেন, বক্তৃতা দেন। প্রগতির নামে মুসলিম সমাজে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি প্রসারের কঠোর বিরোধিতায় তিনি আপোসহীনভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন।

কেউ কেউ বলে থাকেন যে, তিনি পরবর্তীতে তার ধর্মীয় চিন্তা পরিবর্তন করেছিলেন। দু'একটি ক্ষেত্রে মূলধারার বিপরীতে তিনি ভিন্নমত পোষণ করতেন, এ কথা সত্য; কিন্তু সামগ্রিক ভাবে তাঁর ধর্মীয় চিন্তায় কোন পরিবর্তন আসে নি। যার সাক্ষ্য পাওয়া যায় তাঁর নিজেরই উক্তিতে। শেষ জীবনে তিনি নিজের ব্যাপারে বলেছিলেন, 'আমাকে যদি কোন বিশেষ চিন্তাধারার লোক বলে চিহ্নিত করতে চাও, তাহলে আমাকে ওহাবী বলো'।[১৬] শেষ জীবনেও তিনি বিলম্ব না করে আহলেহাদীছগণের ন্যায় আছরের ছালাত দ্রুত আদায় করতেন'।[১৭]

মাওলানা আকরম খাঁ তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বেও অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি খৃষ্টান মিশনারীদের সঙ্গে বিতর্কে অবতীর্ণ হতেন। মিশনারীদের জবাবে তিনি 'মূল বাইবেল কোথায়?' ও 'যীশু কি নিষ্পাপ' শিরোনামে দু'টি প্রবন্ধও লিখেছিলেন'।[১৮] হিন্দু শাস্ত্রের বেদ-পুরাণ-গীতা ইত্যাদি সম্পর্কে তিনি জ্ঞান রাখতেন। একবার সরস্বতী পূজার উপর লিখিত তাঁর একটি প্রবন্ধ নিয়ে 'দৈনিক আজাদ' বনাম 'আনন্দবাজার' তুমুল বিতর্ক চলেছিল। আকরম খাঁ আজাদে পূজার উপর একটি সম্পাদকীয় লিখলে তা আনন্দবাজারের শিরঃপীড়ার কারণ হয়। তখন 'না মহাশয়' শিরোনামে একটি সম্পাদকীয় লিখে আনন্দবাজার পত্রিকা ক্ষোভ প্রকাশ করে। এর পাল্টা জবাবে আকরম খাঁ 'হা মহাশয়' শিরোনামে ফের একটি প্রবন্ধ লেখেন। মাওলানার এই জবাবে আনন্দবাজার আর কোনো উচ্চবাচ্য না করে একদম চুপ হয়ে যায়'।[১৯]

সাংবাদিকতা :

মাওলানা আকরম খাঁ খুব অল্প বয়সে (ছাত্র জীবনেই) সাংবাদিকতায় যোগদান করেন। তিনি সাপ্তাহিক 'আহলে হাদিস' পত্রিকায় প্রথম লেখালেখি শুরু করেন'।[২০] এই সময় তিনি হাজী আব্দুল্লাহর নযরে পড়েন (যিনি ছিলেন 'মোহাম্মদী' পত্রিকার মালিক), তিনি আকরম খাঁর লেখা পড়ে চমৎকৃত হলে আকরম খাঁকে ডেকে বলেন, 'বাবা! আমি তোমাকে প্রেসসহ আনুষঙ্গিক সব ব্যবস্থা করে দেব। তুমি পত্রিকা বের করতে পারবে?' এই সুবর্ণ সুযোগ হাতে পেয়ে আকরম খাঁ রাযী হয়ে যান'।[২১] মাত্র ৫১ টাকা পকেটে নিয়ে ১৯০৩ সালে

---

১১. আবু জাফর সম্পাদিত, মওলানা আকরম খাঁ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন, দ্বিতীয় সংস্করণ : মে ২০০৭), পৃ. ৬৭।
১২. মওলানা আকরম খাঁ, পৃ. ৯০-৯১।
১৩. রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা, পৃ. ২৫৩।
১৪. মওলানা আকরম খাঁ, পৃ. ৯৭, ১০০, ২৭৬।
১৫. রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা, পৃ. ১৩৮-১৩৯।
১৬. মওলানা আকরম খাঁ, পৃ. ১৪৭।
১৭. মুহিউদ্দীন খান, জীবনের খেলাঘরে (মাসিক মদীনা পাবলিকেশান্স, প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারী, ২০১৯), পৃ. ২৬৭।
১৮. মওলানা আকরম খাঁ, পৃ. ১৮৭।
১৯. মওলানা আকরম খাঁ, পৃ. ১০৭-১০৮।
২০. ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী সম্পাদিত, আজাদ ও সমকালীন সমাজ (বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০০৪), পৃ. ০৯।
২১. মাসিক আত-তাহরীক, সেপ্টেম্বর ২০২০, পৃ. ০৬।

(মতান্তরে ১৯০৮/১৯১০ সালে) আকরম খাঁ সাপ্তাহিক মোহাম্মদী পত্রিকা বের করেন'।[২২] পরবর্তীতে ১৯২২ সালে মোহাম্মদীর 'দৈনিক' ও ১৯২৭ সালে 'মাসিক' সংখ্যা প্রকাশ করেন। প্রকাশনা শুরুর পর পরই 'মোহাম্মদী' প্রথম সারির পত্রিকা হিসেবে উঠে আসে।

১৯২৫ সালে প্রকাশিত 'সাপ্তাহিক হানাফী' নামক পত্রিকা সাপ্তাহিক মোহাম্মদীর সাথে প্রতিযোগীতায় অবতীর্ণ হয়। কিন্তু সাপ্তাহিক মোহাম্মদীর যুক্তিবাদী ও বিশ্লেষণধর্মী রচনার মোকাবেলায় 'হানাফী' তেমন জনপ্রিয় হ'তে পারেনি। মোহাম্মদী অনেক বেশী জনপ্রিয় ছিল। বাংলার মফস্বল অঞ্চলে এমন স্থান কমই ছিল, যেখানে সাপ্তাহিক মোহাম্মদীর অনুপ্রবেশ ঘটেনি'।[২৩] তবে মোহাম্মদী নিজে থেকে মাযহাবী কোনো কোন্দলে লিপ্ত হতো না বলেই প্রমাণ পাওয়া যায়। বরং আহলেহাদীছ সম্বন্ধে হানাফী সম্প্রদায়ের আলিমগণ দু-একখানি পত্রিকায় যে সব তীব্র সমালোচনা বের করত, প্রধানত সেগুলোর উত্তরে পাল্টা সমালোচনা বা জবাব দেয়া হতো মোহাম্মদীর মাধ্যমে'।[২৪]

সমাজে প্রচলিত শিরক, বিদ'আত ও কুসংস্কার দূর করে বাঙালি মুসলিমদের ইসলামের সঠিক রূপরেখা দেখানোই ছিল মোহাম্মদীর আত্মপ্রকাশের মূল লক্ষ্য। যদিও আকরম খাঁ কর্তৃক মোহাম্মদীর দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথম তিন বছর মোহাম্মদী সত্যিকার অর্থেই মোহাম্মদী জামাতের ও তাদের আদর্শের নকীব ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে মোহাম্মদী তার নামটুকু ছাড়া আদর্শিক স্বতন্ত্র বজায় রাখতে সক্ষম হয় নি'।[২৫] রাজনীতিতে জড়িত থাকার কারণে ও সর্বভারতীয় মুসলিমের জাতীয় স্বার্থ রক্ষার প্রেক্ষিতেই সম্ভবত মাওলানাকে মোহাম্মদী আদর্শের সাথে শিথিলতা প্রদর্শন করতে হয় এবং ইতিহাস থেকে এমনই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত মেলে।

ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে বঙ্কিমের 'বন্দেমাতরম্'-কে গ্রহণ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামে শ্রীপদ্মকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এক বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন শুরু হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্রদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং মুসলমান ছাত্রদের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণের স্বরূপ উন্মোচনে 'মাসিক মোহাম্মদী' একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। তারপর ছাত্রদের আন্দোলন ও মাসিক মোহাম্মদীর যুগান্তকারী ভূমিকায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নতিস্বীকার করে মনোগ্রাম থেকে 'শ্রী' প্রতীক বাদ দিতে বাধ্য হয়'।[২৬]

হিন্দুদের প্রধান পত্রিকা 'আনন্দবাজার', 'বসুমতী', 'প্রবাসী' সর্বদাই মুসলিম বিরোধী প্রচারণায় লিপ্ত থাকত। তবে কলকাতার 'প্রবাসী' এবং ঢাকার 'শিখা গোষ্ঠী' ছিল মাসিক মোহাম্মদীর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। আর মাওলানা আকরম খাঁ মোহাম্মদীর মাধ্যমে এদের উপযুক্ত জবাব দিতেন বলে-ই ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়'।[২৭]

১৯৩৬ সালের ৩১শে অক্টোবর অবিভক্ত ভারতের কলকাতা থেকে আকরম খাঁ প্রথম 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকা প্রকাশ করেন। এটি ছিল তৎকালীন মুসলিম বাংলার একমাত্র দৈনিক পত্রিকা। মাওলানা আকরম খাঁর সারা জীবনের সেরা কীর্তি ছিল 'দৈনিক আজাদ'। আজাদ বাংলার মানুষের কাছে এতোটাই গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল যে, আজাদে যা লেখা হতো, বাংলার রাজনীতি ও মুসলিম সমাজের চিন্তা সেদিকেই মোড় নিত। প্রকাশকাল থেকেই এটি প্রধানত মুসলিমদের (বা বলা যায় মুসলিম লীগের) মুখপাত্র হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে দৈনিক আজাদের ভূমিকা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। যেহেতু আজাদ পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠার প্রচারণায় মূখ্য ভূমিকা পালন করেছিল, তাই স্বভাবতঃ হিন্দুরা আজাদের উপর অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ ছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৫ দিনের মাথায় রাতের বেলা আজাদ অফিস গুণ্ডাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়'।[২৮] ১৯৪৮ সালের অক্টোবর মাসের ১২ তারিখে স্বাধীন ভারতের কলকাতা থেকে আজাদের সর্বশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এরপর ১৩ই অক্টোবর থেকে ১৮ই অক্টোবর পর্যন্ত আজাদের প্রকাশনা বন্ধ থাকার পর ১৯শে অক্টোবর 'দৈনিক আজাদ' পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়'।[২৯]

অবিভক্ত ভারতে মুসলমিদের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় সংবাদপত্র ছিল দৈনিক আজাদ এবং 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী'।[৩০] আর এই দু'টি পত্রিকারই প্রতিষ্ঠাতা-প্রকাশক-সম্পাদক ছিলেন মাওলানা আকরম খাঁ। সে সময় বঙ্গীয় মুসলিমদের অগ্রগতির জন্য অনেক পত্রিকাই আত্মপ্রকাশ করেছিল, তবে সেগুলো দীর্ঘ মেয়াদে টিকতে সক্ষম হয় নি বরং বিভিন্ন কারণে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আকরম খাঁর 'মোহাম্মদী' কখনো বন্ধ হয় নি।'মোহাম্মদী' ও 'আজাদ' ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে আকরম খাঁ 'মাসিক আল-এসলাম' (১৯১৪/১৯১৫ সাল থেকে আনজুমান-এ-উলামা-এ-বাংলার মুখপাত্র হিসাবে), 'দৈনিক সেবক' (১৯২১-২২), খেলাফত আন্দোলনকে জোরদার করার লক্ষ্যে উর্দু 'দৈনিক যামানা' (১৯২০-২৪), ইংরেজি 'The Comrade' (১৯৪৬) পত্রিকা প্রকাশ করেন। 'দৈনিক সেবক'-এ সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কট্টর সমালোচনা লিখলে মাওলানাকে গ্রেফতার করে এক বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয় এবং পত্রিকাটি নিষিদ্ধ করা হয়, এ সময়ই পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়'।[৩১]

---

২২. *উত্তর আধুনিক মুসলিম মন, পৃ. ২৭।*
২৩. *মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর অবদান, পৃ. ২১।*
২৪. *রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা, পৃ. ২৫৩।*
২৫. *আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃ. ৪৬৭।*
২৬. *মওলানা আকরম খাঁ, পৃ. ১১৩।*
২৭. *কালান্তরের অভিযাত্রী, পৃ. ১২৭-১২৮।*
২৮. *আবুল মনসুর আহমদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর (খোশরোজ কিতাব মহল, প্রকাশকাল : জানুয়ারী ২০১৬), পৃ. ২০৮।*
২৯. *আজাদ ও সমকালীন সমাজ, পৃ. ১৩।*
৩০. *জীবনের খেলাঘরে, পৃ. ৮৫।*
৩১. *আহমাদ হা/২৭৫৫১; তিরমিযী হা/১৯০০; ইবনু মাজাহ হা/২০৮৯; মিশকাত হা/৪৯২৮; ছহীহাহ হা/৯১ মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর অবদান, পৃ. ২৫।*

মাওলানা ছাহেবের সাংবাদিক জীবনের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা আছে। উছমানী খেলাফতের (তথা তুরস্ক) বিরুদ্ধে তখন ব্রিটিশদের নীতি মারমুখো হয়ে উঠেছিল। তখন ব্রিটিশদের সমালোচনায় মাওলানা ছাহেব মোহাম্মদীতে খুব জোর কলম চালাতে শুরু করেন। তখন ইংরেজ লাট সাহেবের নির্দেশে দেশ শাসন করা এগজিকিউটিভ কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য নবাব উপাধিধারী এক বাঙালী মুসলিম আকরম খাঁকে আহলেহাদীছ হবার কারণে সুন্নাত জামা'আতের (আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ) বহির্ভূত মনে করতেন। আর যেহেতু তুরস্কের সুলতান সুন্নাত জামা'আতের নেতা তাই হয়তো আহলেহাদীছরা তাকে নাও মানতে পারেন এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি আকরম খাঁর তুরস্কের পক্ষে লেখালেখি করার অযৌক্তিকতা তুলে ধরতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এতে কাজ না হলে তাকে লোভ দেখিয়ে বলেন যে, তুরস্কের সুলতানের পক্ষে লেখা ছেড়ে দিলে আপনার পত্রিকা প্রকাশের সব ব্যবস্থা সরকারী খরচে করা হবে। তখন আকরম খাঁ জবাবে বলেন, 'দেখুন জনাব! খলীফার বিরুদ্ধে চিন্তা করার আগে যেন আমার মস্তিষ্ক বিকল হইয়া যায়, তাঁহার বিপক্ষে লেখনী ধারণ করার পূর্বেই যেন আমার হাত অবশ হইয়া পড়ে। তাঁহার অনিষ্ট সাধনের চেষ্টার আগেই যেন আমার নশ্বর দেহের অবসান ঘটে, খোদার দরবারে এই-ই আমার অন্তরের প্রার্থনা'। এতেও কাজ হ'ল না দেখে এবার তিনি আকরম খাঁকে গুলি করে হত্যার নির্দেশ দেওয়ার ভয় দেখান। কিন্তু মাওলানা দমলেন না, পাল্টা জবাবে মাওলানা বললেন, 'দেখুন জনাব! আমি জীবনে বহুবার শিকার করিয়াছি। বন্দুকের গুলিতে অনেক পাখি মারিয়াছি। আমার প্রতি গুলি নিক্ষিপ্ত হইলে মারা যাইতে পারি, এ ভালোভাবেই জানি। কিন্তু আপনি নিশ্চয় জানিবেন, আমাকে বন্দুকের গুলিতে নিহত করা হইলে আমার দেহ হইতে যত বিন্দু রক্তপাত হইবে, বাংলার বুকে ঠিক ততজন আকরম খাঁ পুনর্বার জন্মিবে'।[৩২]

মাওলানা আকরম খাঁ ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় লিখতেন এবং পত্রিকা প্রকাশে তিনিই প্রথম হিন্দু সমাজের সাথে পাল্লা দিয়ে দক্ষতার পরিচয় দেন (বস্তুত মাওলানার সাথে লড়তে হিন্দুদের পত্রিকাগুলোর লেজেগোবরে অবস্থা হয়ে যেত)। এই জন্য হিন্দু সমর্থক পত্রিকাগুলো মাওলানা আকরম খাঁ কে 'আক্রমণ খাঁ' বলে অভিহিত করতো'।[৩৩] মাওলানা নিজে বহু পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন এবং অসংখ্য সাংবাদিকের জন্ম দিয়ে ও তাদের আশ্রয়স্থল হয়ে যে বিরল নযীর পেশ করেন, তারই যথার্থ প্রতিদান স্বরূপ তিনি 'বাংলার মুসলিম সাংবাদিকতা জনক' হিসাবে ভূষিত হন।

রাজনীতি :

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগ দেবার মধ্য দিয়ে মাওলানা আকরম খাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয়। এরপর ১৯০৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ঢাকায় অনুষ্ঠিত মুসলিম নেতৃবৃন্দের এক রাজনৈতিক অধিবেশনে 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' (All India Muslim League) গঠিত হলে মাওলানা আকরম খাঁ তাতে অন্যতম একজন প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে যোগদান করেন'।[৩৪] আকরম খাঁ ১৯২৪ সাল পর্যন্ত অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। ১৯২০ সালে ঢাকার আহসান মনযিলে এক সম্মেলনে তিনি 'নিখিল ভারত খিলাফত আন্দোলন কমিটি'র সভাপতি নিযুক্ত হন। খেলাফত আন্দোলনে যুক্ত থাকবার সুবাদে আন্দোলনকে জোরদার করার লক্ষ্যে আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের (মাওলানা মোহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলী) সাথে সারা ভারত সফর করেন'।[৩৫] ১৯২৩ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের উদ্যোগে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতিমূলক 'বেঙ্গল প্যাক্ট' চুক্তিতে আকরম খাঁ বিশেষ ভূমিকা পালন করেন, যদিও পরবর্তীতে কংগ্রেসের অসহযোগিতার কারণে তা অকার্যকর হয়ে যায়'।[৩৬]

১৯২৬-২৭ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে তিনি ভারতীয় রাজনীতিতে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন এবং ঐ বছরই (১৯২৭ সালে) কংগ্রেস ত্যাগ করেন। এরপর ১৯২৯ সালে 'নেহরু রিপোর্ট' বিরোধী আন্দোলনে তিনি অংশগ্রহণ করেন'।[৩৭] একই বছর (১৯২৯ সাল) 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি' গঠন হলে মাওলানা আকরম খাঁ এর সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। ১৯৩৫ সাথে এ. কে. ফজলুল হক সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৩৬ সালে এটি 'কৃষক-প্রজা সমিতি' নাম ধারণ করে। কিন্তু ফজলুল হককে তিনি সভাপতি হিসাবে অপসন্দ করার কারণে তিনি সমিতির প্রতি বিরাগভাজন হয়ে পড়েন এবং পরবর্তীতে তিনি কৃষক-প্রজা সমিতি ত্যাগ করেন'[৩৮] এবং মুসলিম লীগে সক্রিয় হন। ১৯৪০ সালে 'লাহোর প্রস্তাব' উত্থাপিত হলে তিনি এর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন এবং পাকিস্তান আন্দোলনে মনোনিবেশ করেন'।[৩৯] দৈনিক আজাদে তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের পক্ষে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে শুরু করেন। কিন্তু 'জমিয়ত-এ-উলামা-এ-হিন্দ' মুসলিম লীগের বিরোধিতা ও কংগ্রেস নীতি অবলম্বন করে অখণ্ড ভারতের দাবী তুললে এর বিকল্প স্বরূপ ১৯৪৫ সালের ১১ই জুলাই কলকাতায় 'জমিয়ত-এ-উলামা-এ-ইসলাম' নামে একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। মাওলানা আকরম খাঁ এর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন এবং 'জমিয়ত-এ-উলামা-এ-ইসলাম'-এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে ২৪শে অক্টোবর ইংরেজীতে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন'।[৪০]

---

৩২. মওলানা আকরম খাঁ, পৃ. ১৩৬-১৩৭।
৩৩. মওলানা আকরম খাঁ, পৃ. ২১।
৩৪. রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা, পৃ. ২৫২।
৩৫. রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা, পৃ. ২৫৪।
৩৬. উত্তর আধুনিক মুসলিম মন, পৃ. ২৯।
৩৭. মওলানা আকরম খাঁ, পৃ. ৫৮০।
৩৮. রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা, পৃ. ২৫৫।
৩৯. মাসিক আত-তাহরীক, সেপ্টেম্বর ২০২০, পৃ. ০৭।
৪০. রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা, পৃ. ১১৫-১১৬।

দেশ ভাগের পর ১৯৪৮ সালে তিনি 'আজাদ' ও 'মোহাম্মদী' নিয়ে ঢাকায় স্থানান্তিত হন। ১৯৫১ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট পদ থেকে ইস্তফা দেন কিন্তু তবুও আরো কিছু কাল তিনি নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে বহাল থাকেন। পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সাথেও তিনি জড়িত ছিলেন। তিনি রাজনীতি ছেড়ে দিলেও রাজনীতি তাকে ছাড়ে নি। ১৯৫৮ সাথে পাকিস্তানে সামরিক আইন প্রবর্তন হয়। এতে মুসলিম লীগ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়লে আবারো রাজনীতিতে আকরম খাঁর ডাক পড়ে'।[৪১]

১৯৬২ সালে ২৯শে অক্টোবর তাঁর সভাপতিত্বে ঢাকায় আহূত পাকিস্তান মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে জীবনের শেষ কোন সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং খাজা নাজিমুদ্দীনকে সভাপতির দায়িত্ব দিয়ে মাওলানা আকরম খাঁ ৯৪ বছর বয়সে আনুষ্ঠানিকভাবে সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন'।[৪২] পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র সংগ্রামী ভূমিকার কারণে তিনি জিন্নাহ্‌র প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

ভাষা ও শিক্ষা ভাবনা :

মাতৃভাষার বাংলার প্রতি মাওলানার বিশেষ টান ছিল। ১৯২০ সালে আহসান মনযিলে খেলাফত কনফারেন্সে সব নেতারা উর্দূতে বক্তৃতা করলেও শুধুমাত্র যে দু'জন ব্যক্তি বাংলায় বক্তব্য দেন, তার মধ্যে মাওলানা আকরম খাঁ একজন'।[৪৩]

১৯৫২ সালে রাষ্ট্র ভাষা বাংলার পক্ষে আন্দোলনকারীদের উপর গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যপদ থেকে তিনি পদত্যাগ করেন। মুসলিম লীগের নেতা হবার পরেও তিনি বাংলা ভাষার পক্ষে ছিলেন। বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পত্রিকায় তিনি লেখেন, 'দুনিয়ায় অনেক রকম অদ্ভুত প্রশ্ন আছে, বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা কি? উর্দু না বাংলা? এই প্রশ্নটা তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা অদ্ভুত। নারিকেল গাছে নারিকেল ফলবে, না বেল? বঙ্গে মুসলিম ইতিহাসের সূচনা হইতে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষাই তাদের লেখ্য, কথ্য ও মাতৃভাষারূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে এবং ভবিষ্যতেও মাতৃভাষারূপে ব্যবহৃত হইবে'।[৪৪]

মাওলানা আকরম খাঁ মাতৃভাষা নিয়ে যেমন চিন্তা করতেন, তেমন মাতৃভূমির শিক্ষাব্যবস্থা নিয়েও তিনি মাথা ঘামাতেন। ১৯৩২ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা আলবার্ট হলে তিনি বৃটিশ প্রণীত আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় বক্তব্য দেন'।[৪৫] বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অপসংস্কৃতি চর্চার ব্যাপকতা দেখে তিনি বলেছিলেন, 'আজ এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী পালনের যে তোড়জোড় দেখতে পাচ্ছি, এসবের মধ্যে আমাদের বিগত তিন পুরুষের চেষ্টা-সাধনার শোচনীয় ব্যর্থতাই আমি প্রত্যক্ষ করছি'।[৪৬] আকরম খাঁ পূর্ব পাকিস্তানের শেষ গভর্ণরকে বহু বার তাগাদাও দিয়েছিলেন একটি আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য'।[৪৭]

গ্রন্থরচনা :

সাংবাদিকতা ও রাজনীতির ময়দানে দৌড়ঝাঁপের মধ্যেও মাওলানা আকরম খাঁ মূল্যবান কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন। পাঠকের সমীপে তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের একটা তালিকা দেওয়া হ'ল :

(১) তাফসীরুল কোরআন। এটি সম্পন্ন করতে ১২ বছর সময় লাগে (২) মোস্তফা চরিত। (৩) মোস্তফা চরিতের বৈশিষ্ট্য। (৪) উম্মুল কোরআন। (৫) আমপারার তাফসীর (কাব্যে)। [এটি তিনি কারাগারে বসে লিখেন] (৬) সমস্যা ও সমাধান। (৭) মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস। মাওলানা আকরম খাঁ যখন এই বইটি লেখা শুরু করেন, তখন তিনি ৯৪ বছর বয়সের শেষে এসে উপনীত হয়েছেন। এটি মোহাম্মদীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এছাড়াও 'কোরআনের হজরত ঈছা ও বাইবেলের যিশুখ্রিস্ট' নামক একটি পুস্তিকা রচনার করবেন বলে তিনি মনস্থির করেন এবং এর ভূমিকাও লিখেন'।[৪৮] কিন্তু সম্ভবত পরে তিনি আর এগোতে পারেন নি। আব্দুল গাফ্‌ফার চৌধুরী, আবুল কালাম শামসুদ্দীন ও মুজিবর রহমান খাঁ প্রমুখ আকরম খাঁকে বার বার অনুরোধ করেন তাঁর নিজের একটি 'আত্মজীবনী' লিখতে। কিন্তু তিনি এতে অনীহা প্রকাশ করেন'।[৪৯]

মাওলানা আকরম খাঁর রচিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ হ'ল, (১) মুছলমানের জাতিত্ব ও সংস্কৃতি (২) ব্যাক টু দি কুরআন (৩) রমজানের সাধনা (৪) এছলামের আদর্শ (৫) হজরতের প্রাক-নবুয়ত সমাজসেবা (৬) আমাদের ইতিহাস (৭) বায়তুল্ মাল তহবীল (৮) এছলামের রাজ্যশাসন বিধান (৯) সঙ্গীত সমস্যা ইত্যাদি।

সাহিত্যচর্চা :

সাহিত্যচর্চা মাওলানা আকরম খাঁর এক বিশেষ প্রতিভা। তাঁর লিখিত মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, মোস্তফা চরিত, কাব্যে আমপারার তাফসীর এবং কোরাআনের তরজমা বাংলা সাহিত্যে এক বিশাল দান।

মাওলানা কর্তৃক সূরা ফাতিহার বঙ্গানুবাদ পাঠকের সমীপে পেশ করা হ'ল : 'যাবতীয় কৃতজ্ঞতা আল্লাহরই প্রাপ্য, যিনি সকল জাহানের প্রভু পরওয়ারদেগার, যিনি করুণাময়,

---

৪১. রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা, পৃ. ২৫৬।
৪২. মাসিক আত-তাহরীক, সেপ্টেম্বর ২০২০, পৃ. ০৭।
৪৩. আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, পৃ. ২১।
৪৪. কালান্তরের অভিযাত্রী, পৃ. ১২৫-১২৬।
৪৫. মাসিক আত-তাহরীক, সেপ্টেম্বর ২০২০, পৃ. ০৩।
৪৬. জীবনের খেলাঘরে, পৃ. ২৬৯।
৪৭. জীবনের খেলাঘরে, পৃ. ২৩৩।
৪৮. মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস (ঐতিহ্য, প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারী ২০০২), পৃ. ০৯।
৪৯. মওলানা আকরম খাঁ, পৃ. ১৫২-১৫৩।

কৃপানিধান, যিনি বিচার দিবসের মালিক, (হে আমাদের পরওয়ারদেগার) আমরা ইবাদত করি একমাত্র তোমারই-আর সাহায্য প্রার্থনা করি একমাত্র তোমারই নিকটে, আমাদিগকে পরিচালিত করিও সরল সুপ্রতিষ্ঠিত পথে-যাহাদের উপর কৃপা করিয়াছ তাদের (অবলম্বিত) পথে, কিন্তু দণ্ডভাজন করা হইয়াছে যাহাদিগকে এবং সুপথহারা হইয়াছে যাহারা তাহাদের পথে নহে'।[৫০]

১৯৩৭ সালের ২৩শে মে দৈনিক আজাদে প্রকাশিত মাওলানার 'য়্যা মোহাম্মদ আন্তা রাসূলুল্লাহ' কবিতা তাঁর সাহিত্য প্রতিভার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। সুফিয়া কামাল, কাজী নজরুল ইসলাম সহ অনেক কবি সাহিত্যিকের প্রবন্ধ ও কবিতা মাওলানা ছাহেব মোহাম্মদীতে নিয়মিত প্রকাশ করতেন। বাংলার মুসলিমরা হামেশা তাদের কথায় যে সব আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহার করে থাকে, সে সব শব্দকে সাহিত্যে স্থান দেবার জন্যও মাওলানা প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। ১৯১৮ সালে চট্টগ্রামে এক সাহিত্য সমিতির সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করেন এবং এক স্মরণীয় ভাষণ দেন'।[৫১]

মাওলানার অনেক কবিতা মুখস্থ ছিল, আলাপ-আলোচনায় সুযোগ আসলে তিনি সেগুলো আবৃতি করতেন। তবে আকরম খাঁ পুঁথি সাহিত্যের বিরুদ্ধে ছিলেন। বেশ কয়েক রিকশা বোঝাই পুঁথি সাহিত্যের বই মাওলানা সাহেব আনিয়ে ছিলেন অধ্যায়নের জন্য, কিন্তু এসব পুঁথিতে ইসলামকে বিকৃতভাবে তুলে ধরার কারণে তিনি হতাশ হোন এবং এরপর আর কখনো পুঁথি সাহিত্যের ব্যাপারে তিনি উৎসাহ দেখান নি'।[৫২]

মাওলানা আকরম খাঁ প্রচুর পরিমাণে অধ্যায়ন করতেন। তাঁর সংগ্রহে ছিল অজস্র কিতাবপত্র। মাওলানা মুহিউদ্দিন খান লিখেছেন, 'এখন এই বিরাট ঢাকা শহরে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ বা আব্দুল্লাহিল কাফীর ব্যক্তিগত লাইব্রেরীর ন্যায় একটা লাইব্রেরী কেউ গড়ে তুলতে পারেন নি। পারেন নি মানে সেই রুচি ও মত গরজবোধই যেন বিলুপ্ত হয়ে গেছে'।[৫৩]

কিছু অসঙ্গতি :

মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মু'জেযাকে মূলধারার আলিমগণ যেভাবে মানতেন, আকরম খাঁ সেগুলোকে সেভাবে মানতেন না। ইসলামের অলৌকিক বিষয়সমূহের ব্যাপারে তিনি মানবীয় জ্ঞান ও যুক্তির ব্যবহার করে ভিন্ন ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছিলেন'।[৫৪] সঙ্গীত সমস্যা বইয়ে তিনি সঙ্গীতকে নিষিদ্ধ নয় বলে মত প্রকাশ করেছেন। তিনি সম্ভবত এ ব্যাপারে যাহেরীদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। এছাড়া মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মহানুভবতার প্রমাণে মোস্তফা চরিতে তিনি খৃষ্টান মিশনারী ও প্রাচ্যবিদদের (Orientalist) অনেক মন্তব্য হাযির করেছেন, অনেকেই তা ভালোভাবে গ্রহণ করেন নি। তবে পরে এ সম্পর্কে মাওলানার কাছে অভিযোগ করা হলে তিনিও তা স্বীকার করে নেন'।[৫৫]

মৃত্যু :

১৩৭৫ সালের ২রা ভাদ্র মোতাবেক ১৯৬৮ সালের ১৮ই আগস্ট সন্ধ্যা ৬টা ৫ মিনিটে ঢাকাস্থ বাসভবনে শত বৎসর বয়সে মাওলানা আকরম খাঁ নশ্বর এই দুনিয়া ত্যাগ করে রবের সান্নিধ্যে যাত্রা করেন। তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সকল অনুরোধ উপেক্ষা করে সরকারী জাতীয় কবরস্থান বাদ দিয়ে তাঁর অছিয়ত অনুযায়ী বংশাল মালিবাগ আহলেহাদীছ কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়'।[৫৬]

মাওলানা আকরম খাঁর মৃত্যুতে তৎকালীন পাকিস্তানের বিখ্যাত সব পত্রিকায় বিশেষ বিশেষ সম্পাদকীয়-নিবন্ধ প্রকাশ করা হয়।

১৯শে আগষ্ট দৈনিক আজাদে লেখা হয়, 'শতাব্দীর সূর্য চিরঅস্তমিত হইয়াছে। এক শতাব্দীর এক সংগ্রামী ও সৃষ্টিমুখর ইতিহাসের প্রাণস্পন্দন চিরদিনের মত নিরব হইয়াছে'।

'দৈনিক পয়গামে' লেখা হয়, 'একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িল। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ আর ইহলকে নাই'। ২০শে আগষ্ট 'ইমরোজে' লেখা হয়, 'মওলানা আকরম খাঁর মৃত্যুতে পাকিস্তান তাহার এক মহান সন্তান হইতে বঞ্চিত হইয়া গেল'।

এছাড়াও 'দৈনিক পাকিস্তান', The Pakistan Observer, The Morning News, 'দৈনিক আগাজ', দৈনিক কোহিস্তান', 'হুররিয়াত' এবং 'পাসবান' পত্রিকাও শোকবার্তা প্রকাশ করে।

শেষ কথা :

মাওলানা আকরম খাঁ ছিলেন একাধারে আলিম, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ, সমাজ সংস্কারক ও সাহিত্যিক। শত বর্ষের এক জীবন্ত ইতিহাস। উনিশ ও বিশ শতকের পিছিয়ে পড়া মুসলিমদের জন্য তিনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন, সংগ্রাম করেছেন সাম্রাজ্যবাদী শাসন থেকে মুক্তির জন্য। ঔপনিবেশিক শাসন ও হিন্দুদের প্রভাবে আত্মপরিচয়ের সংকটে ভোগা মুসলিমদের তিনি আত্মপরিচয়ের সন্ধান দিয়েছেন। লড়েছেন মুসলিম সমাজের নৈতিক, আদর্শিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র রক্ষার তাগিদে। কিন্তু তাঁর চর্চা আজ আমাদের ধর্ম চিন্তা এবং জাতীয় জীবনে অনুপস্থিত। এদেশে তার নামে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা ইন্সটিটিউট নেই; পাঠ্য পুস্তকে নেই তাঁর দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনের ছিটেফোঁটাও। বিচ্ছিন্ন কিছু ছিন্নপত্র ছাড়া নেই তাঁর কোনো পূর্ণাঙ্গ জীবন ভাষ্য। তিনি আমাদের থেকে, আমাদের দেশ থেকে আলাদা বিচ্ছিন্ন এক সত্তা হিসাবে রয়েছেন। অথচ এই আমরা, এই আমাদের দেশ এবং যা কিছু আমরা অর্জন করেছি তার মূলের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন এই মহান মানুষটি।

[লেখক : ছাত্র (অনার্স ১ম বর্ষ), রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।]

---

৫০. মওলানা আকরম খাঁ, পৃ. ১২১-১২২।
৫১. মওলানা আকরম খাঁ, পৃ. ২৭১।
৫২. মওলানা আকরম খাঁ, পৃ. ১৫৬-১৫৭।
৫৩. জীবনের খেলাঘরে, পৃ. ১৭৮।
৫৪. উত্তর আধুনিক মুসলিম মন, পৃ. ৩৪; মওলানা আকরম খাঁ, পৃ. ১০০, ১৬৩।
৫৫. মওলানা আকরম খাঁ, পৃ. ১২০।
৫৬. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃ. ৪৬৯।

মেঘ-ঝর্ণার বিস্তীর্ণ প্যানারামায় দু'দিন

-আব্দুল্লাহ আল-মুছাদ্দিক

ঘন অরণ্য, সাদা মেঘ আর সগর্জন ঝর্ণা- প্রকৃতির সবকিছুই অপরূপ সুন্দর এবং রহস্যময়। যার সংস্পর্শ আপনাকে করবে উদ্দীপ্ত এবং প্রশান্ত। আর এর সাথে যদি যুক্ত হয় দ্বীনী ভাইদের সাথে পাওয়ার আকুলতা, তবে তা যেন পরিণত হয় আল্লাহ্র জন্য ভালোবাসাময় এক অফুরন্ত জান্নাতী নহর। প্রতি বছর তৃষ্ণার্ত কাকের ন্যায় মুখিয়ে থাকি কখন আসবে প্রিয় সংগঠন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর বার্ষিক শিক্ষা সফর। মাঝেমধ্যে মনে হয় অপেক্ষার পালা যেন শেষই হয় না। অবশেষে এল সেই ক্ষণ। নির্ধারিত স্থান প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি বান্দরবান। বান্দরবান নাম শুনেই মনে পড়লো রবীন্দ্রনাথের পংক্তি সমূহ;

'বর্ষায় প্রপাতের সৌন্দর্য দেখার বড় স্বাদ
জুম ঘরে বসে বৃষ্টি দেখার আহ্লাদ,
পিচ্ছিল পাথুরে পথে দুঃসাহসিক অভিযান
দুর্গম বন পেরোবো হাতে নিয়ে প্রাণ'।

নির্ভেজাল তাওহীদী জাগরণ সৃষ্টিকারী যুব কাফেলা 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কর্মীদের প্রাণোচ্ছলতায় মুখরিত হবে খ্রিস্টান মিশনারী প্রভাবিত বান্দরবান। একথা ভাবতেই মনের গহীনে পল্লবিত হল আশার জাগরণ।

২৮শে অক্টোবর ভোরের প্রথম প্রহর। পাখিরা তখনো ঘুম থেকে জেগে উঠেনি। ইতিমধ্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কর্মী ও সুধীরা বান্দরবান শহরে গ্র্যান্ড ভ্যালি রিসোর্টে চলে এসেছে। গ্র্যান্ড ভ্যালির গ্রাউন্ড ফ্লোরে ফজরের জামা'আত শুরু হল। ইমাম ছাহেবের সুললিত কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াতের সুর লহরী যেন একটি সুন্দর দিনের আগমনীবার্তা ছড়িয়ে দিল। ইতিমধ্যে বান্দরবানের দ্বীনী ভাইরা আমাদেরকে স্বাগত জানালেন। সকাল ৭টায় কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ভাই বান্দরবান পৌঁছালেন। পৌঁছে গেলেন যুবসংঘ-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আবুল কালামসহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলবৃন্দ। শুরু হল শিক্ষাসফর আরম্ভের চূড়ান্ত তোড়জোড়। 'যুবসংঘে'র নাম এবং লোগো সম্বলিত টি-শার্ট সবার হাতে হাতে পৌঁছে দিয়ে সর্বশেষ আমার ভাগে ডাবল এক্সেল টি-শার্ট জুটলো। কি আর করা। টি-শার্টকে পাঞ্জাবী ভেবে সাথে রেখে দিলাম। সকাল ৮টায় বান্দরবান শহর থেকে থানচির উদ্দেশ্যে ছয়টি চাঁদের গাড়ি ৭৫ জনের কাফেলা রওনা হল।

শহর পেরিয়ে উঁচুনিচু পাহাড়ী পথের প্রারম্ভিকায় সংক্ষিপ্ত নাশতা বিরতি দেওয়া হল। নাশতা শেষে কেন্দ্রীয় সভাপতি মহোদয় ভ্রমণের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বর্ণনা করলেন। বিশেষ করে শিক্ষাসফরের আনন্দঘন মুহূর্তগুলোকেও কিভাবে ইবাদতে পরিণত করা যায় এ বিষয়ে তিনি সংক্ষিপ্ত অথচ চমৎকার নছীহত প্রদান করলেন। যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা নিক্ষেপ না করতে যোর তাকীদ প্রদান করেন। বাস্তবিকার্থে আমরা বাঙালিরা ৫৬ হাযার বর্গের এই স্বদেশকে ছোটখাটো একটি ডাস্টবিন বানিয়ে ফেলেছি। দেশের গন্ডি পেরিয়ে আমেরিকা মহাদেশের পর্বতশৃঙ্গেও বাংলাদেশের শপিংব্যাগ পাওয়া যায়। শৃঙ্খলা-আনুগত্য, ধৈর্য এবং পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার দীপ্ত শপথ নিয়ে পুনরায় সবাই গাড়িতে উঠলাম। বান্দরবান-থানচি সড়কের প্রায় ৮৩ কি. মি. এই পথ মনে হল মেঘের রাজ্যের মধ্য দিয়েই চলছি। শরতাকাশের মেঘের ভেলায় চড়ে এমন রোমাঞ্চকর ভ্রমণ সবাইকে বিস্ময় বিমুগ্ধ করে তুলল। এ যেন শিলিগুড়ি টু দার্জিলিং 'হিলকার্ট' রোড।

যতোই আমরা সামনে চলছি ততোই ভারী মেঘদলের দেখা মিলছে। দ্বীনী ভাইদের সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবর ধ্বনিতে মুখরিত হল পাহাড়ি পথ, জঙ্গল। পথেই দেখা মিলল মিলনছড়ি শৈলপ্রপাত আর চিম্বুক, নীলগিরির অপরূপ সৌন্দর্য ঘেরা পাহাড় মেলা। পথে পথে উপজাতি গ্রাম। মোড়ে মোড়ে অস্থায়ী বাজারে পেপে, আনারস, কলার আধিপত্য। বেলা গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে মেঘদলেরা ক্লান্ত হয়ে ফিরে যায়। মাঝেমধ্যে শিশুদের হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। সারি সারি পাহাড় শ্রেণী মাড়িয়ে দুপুর ১২টা নাগাদ আমরা থানচি বাজারে এসে পৌছলাম। পথে পথে চেকপোস্টের ভোগান্তি আমাদের খুঁনসুটিতে বাধা হল না একটুকুও। তপ্ত দুপুরে থানচী ব্রীজে দাঁড়িয়ে সাংগু নদীর সৌন্দর্য সবাই অবলোকন করছি আর ভাবছি এ যেন বাংলার পাঁজরে এক টুকরো সোয়াত উপত্যকা। ক্লান্ত দেহ, ক্লান্ত শরীরে যোহরের ছালাত শেষে দুপুরের খাবার পরিবেশন করা হল। তৃপ্তিকর খাবার শেষে শুরু হল বিরক্তিকর প্রশাসনিক ঝামেলা। বহু ভোগান্তি শেষে রেমাক্রীর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরুর অনুমতি মিলল। নিরাপত্তার মোড়কে পদে পদে হয়রানির এ বৃত্ত থেকে আমরা ঠিক কবে বের হব তা জানিনা।

সাংগু নদীর স্রোতের সাথে সুর মিলিয়ে ১৬টি ইঞ্জিন চালিত বিশেষ নৌকাযোগে আমাদের এবারের গন্তব্য তিন্দু, বড় পাথর হয়ে রেমাক্রি। থানচি থেকে রেমাক্রি যাওয়ার এ পথটি যেন আজীবন ধরে রাখার মতো সুখস্মৃতি। দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলছে খরস্রোতা সাংগু। নদীর সাথে পাথরের এক অদ্ভুত মিতালী ঘেরা এই পথ। নদীর মাঝে বড় বড় পাথর। সেই পাথর মাড়িয়ে খুব সাবধানে এগিয়ে চলা। কবেকার কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা নিতান্তই আল্লাহ্র ইচ্ছায় নদীর বুকে মনলোভা এই দৃশ্য। কিছুদূর যেতেই পাহাড়ি বৃষ্টি এসে আমাদের ভিজিয়ে দিল। সারাদিনের সকল ক্লান্তি ধুয়ে মুছে নদীর সাথে মিশে গেলো। সে এক অদ্ভূত উপভোগ্য অনুভূতি। পথেই দেখা মিললো ছবির মতো সুন্দর তিন্দু গ্রাম, রাজাপাথর, কলস পাথরের দৃশ্য। নদীপথটি এমন যে, কিছুদূর পরপর হঠাৎ বেশ ভয়ংকরভাবে ঢালু হয়ে নিচে

নেমেছে, আবার হঠাৎ উঁচু হয়ে উঠে গেছে। এ যেন উঁচুনিচু পাহাড়ী সড়কপথেরই নদীরূপ। দু'পাশে উঁচু উঁচু পাহাড়। সবুজে মোড়ানো প্রতিটি পাহাড় যেন মেঘের কোলে শুয়ে আছে অবলীলায়। পাহাড়ের চূড়ায় হঠাৎই দেখা মিলে দু'একটি উপজাতি বসতি। সুবোধ বালকেরা কেউ মাছ ধরছে, আবার কেউ গোসল করছে। নদীকে ঘিরেই তাদের জীবন। এসব দেখতে দেখতে আড়াই ঘন্টার নৌ অভিযাত্রা কখন যে

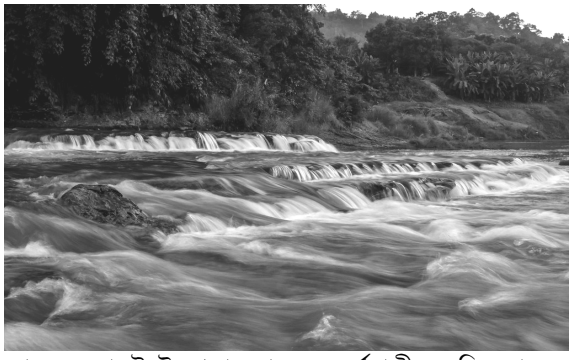

শেষ হল তা টেরই পেলাম না। এক বর্ণনাতীত অভিজ্ঞতা।

সাজ্ঞু বেয়ে নাফাখুম যাওয়ার পথে সর্বশেষ জনপদ রেমাক্রি। পাহাড়ী জলপ্রপাত ঘেরা জনপদ রেমাক্রির কথা যে কোন ভ্রমণপিপাসুর মনে থাকবে সারাজীবন। সূর্য ডোবার মুহূর্তে নায়াগ্রা জলপ্রপাতের ক্ষুদ্রতম সংস্করণ রেমাক্রির মৃদু আছড়ে পড়া পানিতে আমরা ক'জন গোসল করলাম মনের সুখে। বড় চাতালের মতো উঠান ঘিরে পাহাড়ীদের ছোট ছোট ঘর-বাড়ি। তার গা ঘেঁষে সরু রাস্তা আর শুধুই নির্জনতা।

নৌকা বদলিয়ে এবারের নতুন গন্তব্য নাফাখুম। সূর্য ততক্ষণে পশ্চিমাকাশে হেলে পড়েছে। নৌকার বেশ সংকট। অনেক জল্পনা-কল্পনা শেষে কয়েকটা নৌকা এল। ধীরে ধীরে নৌকা চলতে লাগলো। প্রকৃতিতে ততক্ষণে ঘন তমসা নেমে এসেছে। পিনপতন নীরবতা ছেদ করে পক্ষীকূলের হরেক রকম শব্দ ভেসে আসে। গা ছমছম করে ওঠে। অপরদিকে নৌকা সংকটে অনেকে পিছনে আটকে আছে। নদীর মাঝে বড় বড় পাথরখন্ড বারবার নৌকার পথ রুদ্ধ করে যাচ্ছে, কিছুদূর যাওয়ার পর আমাদেরকে ঝিরিপথে নামিয়ে মাঝিরা বাকীদেরকে আনতে গেল। সাথে থাকা গাইডরাও কোথায় যেনো হারিয়ে গেল। বলে রাখা ভালো, থানচির পরে এই অঞ্চলে কোথাও কোনো মোবাইল নেটওয়ার্ক নেই। পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন কোন রাজ্য যেন। রাতের অন্ধকারে আমরা বিভিন্ন জায়গায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে পড়ি। একেক দলে আমরা প্রায় ৮/১০ জন করে ছিলাম। এক্ষেত্রে আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা কাজে লাগালাম। ঝিরি পথে পানির বয়ে চলা প্রমাণ করে এ ঝিরির উৎপত্তি নাফাখুম থেকে। তাই এই ঝিরিকে অনুসরণ করে, জঙ্গলের পাশ ঘেঁষে সংকীর্ণ রাস্তা ধরে এগিয়ে চললাম। রাতের অন্ধকারে বিপদের ঘনঘটা থেকে বাঁচতে এই মুহূর্তে জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের বিকল্প নেই। বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়া প্রত্যেকটা টিম যেন সংগঠনের একেকটা শাখা স্বরূপ। প্রত্যেক টিমেই রয়েছে এক জন করে লিডার। গাড় অন্ধকার আর জোক-বিচ্ছুর ভয়কে জয় করে ঝিরির পাড় ধরে আমরা রাত্রি সাড়ে সাতটায় নাফাখুম পাড়ায় পৌছলাম। অনেকদূর থেকেই নাফাখুম ঝর্ণার পানি আছড়ে পড়ার শব্দ পেলাম। পানি প্রপাতের এই শব্দশৈলী আমাদের মনে এনে দিল আশার সঞ্চারণ। সর্বোপরি অলী হাসান ভাইয়ের সাহসের তারিফ করতেই হয়।

রাত ৯টার মধ্যে একে একে সবাই চলে আসলো। ঝর্ণার পার্শ্ববর্তী নাফাখুম পাড়ায় তিনটি উপজাতি টং ঘরে রাতে থাকার ব্যবস্থা করা হল। খাবার তৈরী হতে হতে দীর্ঘ সাংগঠনিক আলোচনা শুরু হয়। মৌলভীবাজারের নওমুসলিম আব্দুল্লাহ ও বান্দরবানের ইফতিদার মাশফি ভাই তাদের জীবন কাহিনী শুনালো। সর্বোপরি রংপুরের মোস্তফা সালাফী ছাহেবের কমিউনিস্ট থেকে আহলেহাদীছ হওয়ার ইতিবৃত্ত সবাইকে আবেগাপ্লুত করল। সবশেষে শরীফুল ইসলাম মাদানী এবং ড. ছাকিব ভাই নছীহতমূলক বক্তব্য রাখলেন।

ইতিমধ্যে রাতের খাবার চলে এলো। খাবার শেষে ঝর্ণার কোলঘেঁষে নির্মিত এ টং ঘরে ঘুমিয়ে পড়ি। ঝর্ণা-ঝিরিধারার পানিপতনের শব্দে দিনের আলো ফোঁটার পূর্বেই সবার ঘুম ভাঙ্গে। বাদ ফজর তিনটি টং ঘরে পৃথকভাবে দারস দেন যথাক্রমে আবুল কালাম, শরীফুল ইসলাম মাদানী, সোহেল বিন আকবর মাদানী ও আরজু হাসান সাব্বির। আমাদের আচরণে মুগ্ধ হয়ে খৃষ্টধর্মাবলম্বী ঘরের মালিক কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী আবুল কালাম ভাইকে এক ছড়ি কলা উপহার দেন। তিনি বলেন, এখানে অনেক পর্যটক দল আসে। কিন্তু আপনাদেরকেই প্রথম দেখলাম যারা গান-বাজনা, হৈ-হুল্লোড়ের বদলে আল্লাহ্র প্রশংসা করছেন। তারপর ভোরের সূর্য উদয়ের পূর্বেই বেরিয়ে পড়লাম নাফাখুম দর্শনে।

মারমা ভাষায় 'খুম' শব্দের অর্থ ঝর্ণা বা জলপ্রপাত বা জলপতন। রেমাক্রি খালের পানি প্রবাহ পাথুরে পথে নামতে গিয়ে চমৎকার এই জলপ্রপাত সৃষ্টি হয়েছে। তখনো আশেপাশের অনেক পাহাড় মেঘের চাদরে ঢাকা পড়ে আছে। ২০-৩০ ফুট উপর থেকে দ্রুত গতিতে নেমে আসা পানির ফোয়ারা সূর্যের আলোয় বাষ্প হয়ে প্রতিনিয়ত রংধনু খেলা করছে। মেঘের আড়ালে যখন সূর্য হেসে উঠলো, তখন সে হাসির ঝিলিক ছড়িয়ে পড়ে পুরো পাহাড়তটে। ঝর্ণার সৌন্দর্য অবলোকনের জন্য নির্মিত ঝুলন্ত ব্রীজে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ উড়ে আসা

জলকণা বাষ্পে ভেসে শরীরে এসে পড়লো। ক্ষণিকের জন্যে সম্বিত হারিয়ে ফেললাম। রোমাঞ্চকর সে অনুভূতি। পাশেই একটি ছোট্ট টং দোকান। উদাস মনে ভাবছিলাম, জান্নাতে সবুজ গালিচার বুক চিড়ে বয়ে যাওয়া ঝর্ণার পাশে যদি আমার একটি চায়ের টং দোকান থাকে, সাপ্তাহিক হাটের দিনে ছাহাবীরা নিশ্চয়ই সেখানে চা খেতে আসবে। মাঝেমধ্যে প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে দাওয়াত দিব।

ইতোমধ্যে নাশতার জন্য ডাক আসলো। নাশতা সেরে সকাল সাড়ে আটটায় নাফাখুমকে বিদায় জানালাম। খরস্রোতা নদী, পাথুরে ঝিরি আর পাহাড়ের পাশ দিয়ে সবুজে মাখামাখি করে চলতে চলতে মনে হল, জন্মভূমির এমন শোভা আগে কেন দেখিনি? *সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি ওয়া সুবহানাল্লাহিল আযীম।*

জুমক্ষেতের পাশে ছবির মতো সাজানো এ পাহাড়ি গ্রাম পেরিয়ে সরু ট্রেইল ধরে কিছুক্ষণ হাটার পর আমরা নৌকার কাছে পৌছলাম। অতঃপর রেমাক্রিতে এসে আবার যাত্রাবিরতি দেওয়া হল। রেমাক্রিতে এবার কেউই গোসলের সুযোগ হাতছাড়া করলো না। একে একে সবাই নেমে পড়লো। সবাইকে গোসল করতে নেমে এবার আত্মবিশ্বাস আরো তুখোড় হল। সাংগু নদীর স্রোতের সাথে পাল্লা দিয়ে সাতার কেটে নদীর ওপারে চলে গেলাম কয়েকজন। খরস্রোতা এ নদীতে সাতার প্রথমে চ্যালেঞ্জিং মনে হলেও পরক্ষণে ভয় কেটে যায়।

গোসলের শেষ প্রান্তে খেয়াল করলাম কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আজমাল ভাই সবাইকে ক্যামেরাবন্দী করছে। ঝরণার পিচ্ছিল অংশে ছবি তুলতে গিয়ে ফোন হাতে আজমাল ভাইয়ের আছাড় খাওয়ার মনোরম দৃশ্য দেখে তার সাথে খুঁনসুটি আরও বাড়িয়ে দিলাম। ঠিক তখনই খেয়াল করলাম পাহাড়ি জোকের কামড়ে শাকির ভাইয়ের পা থেকে অনর্গল রক্ত ঝরছে। যদিও এটা তেমন আতংকের কিছু না, তবুও কাকতালীয় বিষয় হচ্ছে পাহাড়ি জোঁকেরাও রক্তদান সংস্থা আল-আওনের একজন কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলের রক্ত সহযোগিতা পেয়ে ধন্য হয়েছে।

যাত্রাবিরতি শেষে আবার শুরু হল থানচির পানে দীর্ঘ নৌকা ভ্রমণ। ফেরার পথে সাংগুকে আরও বেশী খরস্রোতা মনে হলো। কিছু কিছু জায়গা এতো ভয়ংকর ছিলো যে নৌকা থেকে নেমে নদীর তীর ঘেষে হেটে পার হতে হল। দুপুর ১২টা নাগাদ সবাই থানচি বাজারে এসে পৌছালাম।

জুম'আর ছালাতের পর শুরু হল আমাদের দাওয়াতী কার্যক্রম। পুরো থানচী বাজার জুড়ে ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) আত-তাহরীক, তাওহীদের ডাক সহ হাদীছ ফাউন্ডেশনের বই সমূহ বিতরণ করা হ'ল। স্থানীয়রাও আগ্রহভরে তা গ্রহণ করলো। আমাদের বই পেয়ে অনেকেই যারপরনাই খুশী হলো। কিন্তু বাঁধ সাধলো প্রশাসনের দায়িত্বশীল ভাইরা। তাদের আচরণ দেখে মনে হলো ভিন্ন মহাদেশ থেকে এসে এখানে মিশনারী কার্যক্রম পরিচালনা করা জায়েয হলেও মানুষকে তাওহীদের দাওয়াত দেওয়া যেন শিরোধার্য অপরাধ। দুপুরের খাবার খেয়ে পাহাড়ি পথ ধরে চান্দের গাড়ি যোগে সবাই রওনা দিলাম বান্দরবানের পথে। পুরো পথ জুড়ে সুরে বেসুরো কণ্ঠে বেজে চলছে আল-হেরার জাগরণী।

দিগন্ত জোড়া সবুজ পাহাড় আর বিস্তীর্ণ প্যানারামার মাঝে যেনো কয়েকটা খেলনার গাড়ি ছুটে চলছে। বিকাল নাগাদ নীলগিরির নীল ক্যাফে সাময়িক বিরতি দেওয়া হল। প্রকৃতি এখানে খুবই বৈচিত্র্যময় এবং ক্ষণে ক্ষণে তার রূপ বদলায়। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২২০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত নীলগিরিতে দাঁড়িয়ে সহসাই দেখা মিলে দেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ সাকাহাফং, বগালেক এবং কেওক্রাডং। নীচের দিকে তাকালে মনে হয় যেনো সবুজের গালিচা বিছিয়ে রেখেছে কেউ। সন্ধ্যার পর সবাই নীলাচল এসে পৌছালাম। রাতের অন্ধকারে টিকেট কেটে ভিতরে প্রবেশের আগ্রহ জাগলো না। মাগরিবের ছালাত শেষে শুরু হল কেন্দ্রীয় সভাপতির সমাপণী ভাষণ। অবশেষে বেজে উঠলো বিদায়ের ঘনঘটা। সবাই সবাইকে আল্লাহ্‌র যিম্মায় সঁপে দিয়ে রওনা দিলাম আপন গন্তব্যে। এত অল্পসময় অথচ কত আপন হয়ে গেল এ মানুষেরা। আমরা ভিন্ন মায়ের সন্তান কিন্তু সংগঠন আমাদেরকে একই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। বাসে ফেরার পথে রাজ্যের সমস্ত ঘুম চোখে নিয়ে ঝিমাচ্ছিলাম আর ভাবছিলাম- যে বান্দরবান দেখেনি, সে বাংলাদেশ দেখেনি।

[লেখক : সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়]

(সম্পাদকীয়র বাকী অংশ)

দেখায় এবং অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেয়। আর আল্লাহ তোমাদেরকে তার পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন' *(বাক্বারাহ ২৬৮)*। এজন্য সর্বদা শয়তানের ফেরেব থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। **পঞ্চমতঃ তাক্বদীর ও তাওয়াক্কুল অবলম্বন করা :** আল্লাহর উপর ভরসা ও তাক্বদীরে বিশ্বাস যে কোন মানুষের জন্য অফুরন্ত আত্মবিশ্বাস ও সুদৃঢ় মনোবলের খোরাক। কেননা সে জানে যে, সবকিছুর নিয়ন্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। বিশ্বাসী বান্দার একান্ত মঙ্গলের জন্যই তাঁর কর্মপরিকল্পনা। এই বিশ্বাস তাকে কখনও পথ হারাতে দেয় না। আশার প্রদীপ নেভাতে দেয় না। বরং বুক ভরে প্রশান্তির নিশ্বাসে সে সর্বাবস্থায় বলতে পারে- আলহামদুলিল্লাহ। সুতরাং আল্লাহর প্রতি এই দৃঢ় ঈমান ও ইস্তিকামাত যে কোন হতাশা থেকে মুক্তির অব্যর্থ মাধ্যম। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে দুনিয়াবী পরীক্ষার মঞ্চে সদা-সর্বদা সত্য ও ন্যায়ের উপর অবিচল রাখুন এবং যাবতীয় হতাশা থেকে মুক্ত থেকে আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রেখে জীবন পরিচালনার তাওফীক দিন। আমীন!

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, গত ১৪ই ডিসেম্বর ২০২২ তাওহীদের ডাক পত্রিকার সম্মানিত উপদেষ্টা সম্পাদক ও বাংলাদেশে আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম (৫২) আমাদেরকে ছেড়ে চিরবিদায় গ্রহণ করেছেন। মহান আল্লাহর কাছে আমরা তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং জান্নাতুল ফেরদাউস কামনা করছি। তাওহীদের ডাক পত্রিকা দ্বিতীয়বার নতুনভাবে প্রকাশের শুরু থেকে তিনি সার্বক্ষণিক আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন এবং সার্বিক পরামর্শ প্রদান করেছেন। তাঁর এই বিদায়ে তাওহীদের ডাক পরিবার এক বিরাট শূন্যতা অনুভব করছে। আল্লাহ তাঁর এই খেদমতকে ছাদাকায়ে জারিয়া হিসাবে কবুল করুন। আমীন!

মুহাম্মাদ মুখতার আশ-শানক্বীতী

-ফরীদুল ইসলাম

ভূমিকা : একজন আলেম আকাশের নক্ষত্রের মত জগতবাসীকে আলোর পথ দেখান। এমন একজন প্রখ্যাত মৌরিতানীয় সালাফী বিদ্বান মুহাম্মাদ মুখতার আশ-শানক্বীতী (১৯১৯-১৯৮৫ খ্রিঃ)। নিম্নে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠকের খেদমতে পেশ করা হ'ল।

জন্ম : মুহাম্মদ আল-মুখতার ইবনে মুহাম্মদ সাইয়্যিদ আল-আমীন ইবনে হাবিবিল্লাহ ইবনে মাযিদ আল-জিকনি আশ-শানক্বীতী ১৩৩৭ হিজরী মোতাবেক ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে উত্তর আফ্রিকার দেশ মৌরিতানিয়ার শানক্বীত প্রদেশের আল-রাশীদ শহরের কাছে শফীক নামক এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হলেন একজন খ্যাতনামা বিদ্বান, শিকড় সন্ধানী গবেষক, ভাষাবিদ এবং মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সহ দুই পবিত্র মসজিদের একজন স্বনামধন্য শিক্ষক।

বেড়ে ওঠা : তিনি মৌরিতানিয়ার শানক্বীতে একটি ইলমী পরিবেশে বেড়ে ওঠেন। তাঁর পিতামহ একজন আলেম ছিলেন। তার পিতা ছিলেন আল মাযিদ আয-যিকনি-এর একজন শায়খ। তিনি ছোটবেলায় তার মায়ের কাছে কুরআন মুখস্থ করা শুরু করেন এবং তার মায়ের মৃত্যু অবধি পড়তে থাকেন। অবশেষে পিতার কাছে তিনি কুরআন হিফয সম্পন্ন করেন। অতঃপর তিনি বিভিন্ন পন্ডিতদের নিকট কুরআনের বিজ্ঞান ও কলা সম্পর্কে পান্ডিত্য অর্জন করেন। ১৩৫৬ হিজরীতে তিনি সঊদী আরবে হিজরত করেন এবং প্রথমে মক্কায় কিছু সময় অতিবাহিত করেন, অতঃপর মদীনায় যান। যেখানে তিনি মসজিদে নববীতে জ্ঞান অন্বেষণে মনোনিবেশ করেন। আবার তিনি মক্কায় ফিরে এসে হারামের বিদ্বানদের নিকট নিরলসভাবে চার বছর ধরে জ্ঞান সমুদ্রে ডুবে থাকেন। যার ফলে তিনি নিজেকে ইসলামী শারঈ জ্ঞানের উচ্চ মর্যাদায় আসীন করাতে সমর্থ হন।

বর্ণাঢ্য কর্মজীবন : শিক্ষাজীবন শেষ করে তিনি মসজিদে নববীতে পাঠদান শুরু করেন। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের পর তিনি সেখানে পাঁচটি হালাকায় পাঠদান করতেন। যেখানে তিনি ফিকহসহ বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদান করতেন। তিনি কুবা মসজিদে প্রতি সপ্তাহের সোম ও বৃহস্পতিবার পাঠদান করতেন। ১৩৬৬ হিজরী পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি জেদ্দার 'আল-ফালাহ' মাদরাসায় শিক্ষকতার জন্য স্থানান্তরিত হন। ১৩৭১ হিজরীতে তিনি অত্র প্রতিষ্ঠানের রিয়াদ শাখায় চলে যান এবং ১৩৭৭ হিজরী পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন। ১৩৭৮ হিজরীতে তাঁকে মদীনার 'দারুল হাদীছে' শিক্ষক হিসাবে নিয়োগদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং একই সময়ে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে তাফসীর পাঠদান শুরু করেন। ১৪০৩ হিজরী পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন এবং অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর আমৃত্যু মসজিদে নববীতে পাঠদানে নিরত থাকেন।

দাওয়াতী খেদমত :

ইসলাম প্রচার ও প্রসারেও তিনি ছিলেন কিংবদন্তী সমতুল্য। তিনি আরবের বহু জায়গায় দ্বীন প্রচার করার জন্য গমন করেন। শুধু তাই নয় তিনি তাঁর নিজের দেশ মৌরিতানিয়াতেও দ্বীনের সুশীতল ছায়া ছড়িয়ে দেন, যাতে মানুষ তাঁর ইলমী জ্ঞানের সংস্পর্শে এসে ধন্য হয়।

ছাত্রবৃন্দ : তিনি জ্ঞানীগুণী বহু ছাত্রের উস্তায ছিলেন। তন্মধ্যে তাঁর পুত্র মুহাম্মদ আল-মুখতার ইবনে মুহাম্মদ আল-আমীন আল-শানক্বিতী অন্যতম। যিনি সঊদীআরবে সর্বোচ্চ উলামা পরিষদ হাইআতু কিবারিল উলামার সদস্য।

আক্বীদা: তিনি আক্বীদায় ছিলেন আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অনুসারী। তিনি আমৃত্যু ভ্রান্ত আক্বীদা, বাতিল দল-মত সহ বিভিন্ন পথভ্রষ্টদের সঠিক আক্বীদায় ফিরে আসার জন্য দাওয়াত প্রদান করেছেন।

লেখনী : লেখনীর জগতে ছিল তাঁর পদাচারণা ছিল তুলনামূলক কম। কুতুবে সিত্তাহ-এর বহুল প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সুনান নাসাঈর ব্যাখ্যাগ্রন্থটি তাঁর জীবনের বড় কীর্তি হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যা شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে।

মৃত্যু : ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে সঊদী আরবে ৬৫/৬৬ বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

[লেখক : ছানাবিয়া ২য় বর্ষ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী]

At-Tahreek TV

অহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য

অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল 'আত-তাহরীক টিভি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছভিত্তিক দ্বীনি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে যাচ্ছে। আমাদের নিয়মিত আয়োজন দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, প্রশ্নোত্তর পর্ব, নবীদের কাহিনী, হাদীছের গল্প, ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথে সহ অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমূহ দেখার জন্য সাবক্রাইব করে সাথে থাকুন।

Youtube লিংক :
www.youtube.com/attahreektv

Facebook লিংক :
www.facebook.com/attahreektv

সার্বিক যোগাযোগ :
আত-তাহরীক টিভি, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৪০৪-৫৩৬৭৫৪।
ইমেইল : attahreektv@gmail.com

হিজাব যেভাবে ইসলামের পথ দেখাল

গল্পটি এক মার্কিন অধ্যাপকের ইসলাম গ্রহণের। জানেন তাঁর ইসলাম গ্রহণের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল কী? হ্যাঁ, তাঁর ইসলাম গ্রহণের প্রথম ও একমাত্র কারণ ছিল এক মার্কিন তরুণীর হিজাব। যিনি তার হিজাব নিয়ে সম্মানবোধ করেন। নিজ ধর্ম নিয়ে গর্ব করেন। শুধু একজন অধ্যাপকই ইসলাম গ্রহণ করেননি। তার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপকদের মধ্যে তিনজন ডক্টর ও চার ছাত্রীও ইসলাম ধর্মে অন্তর্ভুক্ত হন। এ সাতজন ব্যক্তিই অভিন্ন সেই হিজাবকে কেন্দ্র করেই ইসলামে দীক্ষিত হন।

নিজের ইসলামে প্রবেশের গল্প শোনাতে গিয়ে ড. মুহাম্মাদ আকুয়া বলেন, বছর চারেক আগে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সহসা এক বিতর্ক মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এখানে পড়তে আসে এক মুসলিম তরুণী। নিয়মিত সে হিজাব পরিধান করে। ওর শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন একজন কট্টর ইসলাম বিদ্বেষী। যে কেউ তার সঙ্গে বিতর্ক এড়াতে চাইলেও তিনি গায়ে পড়ে তাকে চ্যালেঞ্জ করতেন। আর এমন অনুশীলনরত মুসলিম পেলে তো কথাই নেই। স্বভাবতই তিনি মেয়েটিকে যে কোনো সুযোগ পেলেই উত্যক্ত করতে লাগলেন। এক পর্যায়ে মেয়েটির ওপর একের পর এক কল্পনাশ্রয়ী আক্রমণ করতে লাগলেন। মেয়েটি যখন শান্তভাবে এসবের মোকাবেলা করে যেতে লাগল, তার রাগ আরও বৃদ্ধি পেল। এবার তিনি অন্যভাবে মেয়েটিকে আক্রমণ করতে লাগলেন। তার এডুকেশন গ্রেড বৃদ্ধিতে অন্তরায় সৃষ্টি করলেন। তাকে কঠিন ও জটিল সব বিষয়ে গবেষণার দায়িত্ব দিলেন। কড়াকড়ি শুরু করে দিলেন তাকে নাম্বার দেয়ার ক্ষেত্রে। এরপরও যখন অহিংস পদ্ধতিতে মেয়েটিকে কোনো সমস্যায় ফেলতে পারলেন না, চ্যান্সেলরের কাছে গিয়ে তার বিরুদ্ধে বানোয়াট অভিযোগ দায়ের করলেন।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিল, ছাত্রী ও অধ্যাপক উভয়কে একটি বৈঠকে ডাকা হবে। উভয়ের বক্তব্য শোনা হবে। সুষ্ঠু তদন্ত করা হবে মেয়েটির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের। নির্দিষ্ট দিন এলে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিটির সব সদস্য উপস্থিত হলেন। আমরা সবাই খুব আগ্রহ নিয়ে এ পর্বটির জন্য অপেক্ষায় ছিলাম। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের মোকাদ্দমা এই প্রথম।

বৈঠক শুরু হ'ল। প্রথমে ছাত্রীটি অভিযোগ করল, অধ্যাপক সাহেব তার ধর্মকে সহ্য করতে পারেন না। এ জন্য তিনি তার শিক্ষার অধিকার হরণ করতে পর্যন্ত উদ্যোগী হয়েছেন। সে তার অভিযোগের সপক্ষে কয়েকটি দৃষ্টান্তও তুলে ধরল এবং এ ব্যাপারে তার সহপাঠীদের বক্তব্যও শোনার দাবী জানাল। সহপাঠীদের অনেকেই ছিল তার প্রতি অনুরক্ত। তারা তার পক্ষে সাক্ষী দিল। বস্তুনিষ্ঠ সাক্ষ্য দিতে ধর্মের ভিন্নতা তাদের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারল না। মেয়েটির জোরাল বক্তব্যের পর ডক্টর সাহেব আত্মপক্ষ সমর্থনের ব্যর্থ চেষ্টা করলেন। অব্যাহতভাবে কথাও বলে গেলেন; কিন্তু মেয়েটির ধর্মকে গালি দেয়ার সাহস সঞ্চয় করতে পারলেন না। অথচ মেয়েটি দিব্যি ইসলামের পক্ষে তার বক্তব্য উপস্থাপন করল। ইসলাম সম্পর্কে অনেক তথ্য ও সত্য তুলে ধরল। তার কথার মধ্যে ছিল আমাদের সম্মোহিত করার মত অলৌকিক শক্তি। আমরা তার সঙ্গে বাক্যবিনিময়ে প্রলুব্ধ না হয়ে পারলাম না। আমরা ইসলাম সম্পর্কে আপন জিজ্ঞাসাগুলো তুলে ধরতে লাগলাম আর সে তার সাবলীল জবাব দিয়ে যেতে লাগল। ডক্টর যখন দেখলেন আমরা অভিনিবেশসহ মেয়েটির যুক্তিতর্ক শুনছি, তার সঙ্গে আলাপচারিতায় মগ্ন হয়েছি, তখন তিনি হল থেকে নিরবে বেরিয়ে গেলেন। মেয়েটিকে আমাদের গুরুত্ব দেয়া এবং সাগ্রহে তার বক্তব্য শোনা দেখে তিনি কিছুটা মর্মাহত হলেন বৈকি। এক পর্যায়ে তিনি এবং তার মত যাদের কাছে মেয়েটির আলোচনা গুরুত্বহীন মনে হচ্ছিল তারা সবাই বিদায় নিলেন। রয়ে গেলাম আমরা- যারা তার কথার গুরুত্ব অনুধাবন করছিলাম। তার বাক্যমাধুর্যে অভিভূত হচ্ছিলাম। কথা শেষ করে মেয়েটি আমাদের মধ্যে এক টুকরো কাগজ বিতরণ করতে লাগল। 'ইসলাম আমাকে কী বলে' শিরোনামে সে তার চিরকুটে ইসলাম গ্রহণের কারণগুলো তুলে ধরেছে। আলোকপাত করেছে হিজাবের মাহাত্ম্য ও উপকারিতার ওপর। যে হিজাব নিয়ে এই সাতকাহন এর ব্যাপারে তার পবিত্র অনুভূতিও ব্যক্ত করেছে সেখানে।

বৈঠকটি অমিমাংসিতভাবেই সমাপ্ত হ'ল। মেয়েটির অবস্থান ছিল অত্যন্ত বলিষ্ঠ। যে কোনো মূল্যে নিজের অধিকার রক্ষা করবে বলে সে প্রত্যয় ব্যক্ত করল। প্রয়োজনে আদালত পর্যন্ত যাবে সে। এমনকি তার পড়ালেখা পিছিয়ে গেলেও সে এ থেকে পিছপা হবে না। আমরা শিক্ষা কমিটির সদস্যরা কল্পনাও করিনি মেয়েটি তার ধর্মীয় অধিকার রক্ষার ব্যাপারে এমন অনমনীয় মনোভাবের পরিচয় দেবে। কতজনকেই তো এতগুলো শিক্ষকের সামনে এসে চুপসে যেতে দেখলাম। যা হোক, ঘটনার পর থেকে এ নিয়ে ক্যাম্পাসে বিতর্ক চলতে থাকল। কিন্তু আমি কেন জানি নিজের ভেতর হিজাবের এই ধর্ম নিয়ে প্রবল আলোড়ন অনুভব করলাম। এ ব্যাপারে অনেকের সঙ্গেই কথা বললাম। তারা আমাকে ইসলাম সম্পর্কে জানতে অনুপ্রাণিত করল।

কেউ কেউ উৎসাহ যোগাল ইসলামে দীক্ষিত হতে। এর ক'মাস বাদেই আমি ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলাম। ক'দিন পর দু'জন অধ্যাপক আমাকে অনুসরণ করলেন এবং সে বছরই আরও একজন ডক্টর ইসলাম গ্রহণ করলেন। আমাদের পথ ধরে চারজন ছাত্রও ইসলামে দাখিল হ'ল। এভাবে অল্পকালের মধ্যেই আমরা একটি দল হয়ে গেলাম- আজ যাদের জীবনের মিশনই হ'ল, ইসলাম সম্পর্কে জানা এবং মানুষকে এর প্রতি আহ্বান জানানো। আলহামদুলিল্লাহ অনেকেই ইসলাম কবুলের ব্যাপারে সক্রিয় চিন্তা-ভাবনা করছেন। ইনশাআল্লাহ অচিরেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের ইসলাম গ্রহণের সুসংবাদ শুনতে পারবে। সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য। *[সূত্র : ইন্টারনেট]*

পরপারের যাত্রী

-ড. মুখতারুল ইসলাম

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম ভাইয়ের কথা কোনটা লিখব আর কোনটা ছাড়ব সেটা ভেবেই কুল পাচ্ছি না। কেননা দীর্ঘদিন থেকে তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখা। ১৯৯৬ সালে আমি যখন ক্লাস ফোরের ছাত্র, তখন অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম ভাই 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল। তিনি একাধারে তিন সেশনের সভাপতি ছিলেন। সংগঠনের বিপদসংকুল দিনগুলিতে তিনি বুক পেতে আগলিয়েছেন সবকিছুকে। সংগঠনের সার্বিক দেখভাল করেছেন। মারকাযের ছাত্র হিসাবে 'যুবসংঘ' অফিসে আমাদের ঘোরাঘুরি ছিল ছোট কাল থেকেই। প্রত্যেক দায়িত্বশীল বড় ভাইকেই আমরা শিক্ষাগুরুই মনে করতাম। এরপরও আমাদের কাছে তাঁর একটা বিশেষ শান ও মান ছিল সবসময়।

২০১৪ সালে হঠাৎ তাঁর ফোন পেলাম। তখন আমি গোদাগাড়ীতে কর্মরত ছিলাম। কেমন আছ? আমরা তোমাকে 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় কমিটিতে রাখতে চাচ্ছি, তুমি তোমার মতামত দাও। আমি হতচকিত অবস্থায় পড়ে গেলাম। এতবড় একজন মানুষ আমার মত ছোট মানুষকে ফোন দিয়েছেন। আমি বললাম, দেখেন ভাই, আপনি আমাদের উস্ত াদের মত, যেটি ভাল মনে করেন, করুন। তারপর আমি তাঁর প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক, তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক এবং বর্তমানে সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করছি।

তিনি তাওহীদের ডাক পত্রিকার উপদেষ্টা সম্পাদক ছিলেন শুরু থেকেই। আমি কেন্দ্রে আসার পর পরই 'যুবসংঘে'র মুখপত্র দ্বি-মাসিক 'তাওহীদের ডাক' পত্রিকার দায়িত্ব দিয়ে চরম কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। অনেক শিখেছি তাঁর কাছ থেকে। পরবর্তীতে মারকাযের শিক্ষক হিসাবে যখন আমার নিয়োগ হল। তখন তাঁর কাজের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করার অসাধারণ যোগ্যতা দেখেছি। তিনি খুবই শান্তশিষ্ট, নম্র-ভদ্র ও ক্ষমাশীল মানুষ ছিলেন। তিনি মারকাযের সেক্রেটারীর কঠিন দায়িত্ব বেশ দাপট ও সুনামের সাথে পরিচালনা করতেন। কারো কোন ভুল হলে বোকা দিতেন। আবার পরক্ষণেই স্নেহভরে আদর করে ভুলগুলি শুধরিয়ে দিতেন। বিশ্বব্যাপী করোনার ছোবলে যখন পুরো বিশ্ব ছিন্নভিন্ন, তখন শিক্ষকদের জন্য তিনি যে অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করেছেন, তা ভাষায় বলার মত না। সবাই ঘরে বন্দী, মানবতার মৌলিক অধিকারসমূহ বিশেষকরে খাদ্য সংকটের চরম মুহূর্তে যেভাবে তিনি শিক্ষকদের অভয় দিয়েছেন, খোঁজ-খবর নিয়েছেন তা সত্যিই মানবিক একজন দায়িত্বশীলের চরম ত্যাগের পরকাষ্ঠারই জানান দিয়েছিল। প্রতিষ্ঠানকে অগ্রগতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করানোর জন্য তাঁর নিরলস অবৈতনিক নিখাদ প্রচেষ্টা ও ত্যাগ-তিতীক্ষা সত্যিই প্রবাদতুল্য।

তিনি যখন স্বাভাবিক অসুস্থতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন, বাড়ি থেকে মাদরাসা, আবার মাদরাসা থেকে বাড়ি, এই ডাক্তার থেকে সেই ডাক্তার, ঠিক তখুনি 'যুবসংঘে'র মাননীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ভাই আমাকে তাঁর সাক্ষাৎকার পত্রিকায় দেওয়ার জন্য তাগাদা দিয়েছিলেন। আমি তাঁর নিকট থেকে সাক্ষাৎকারটি আদায় করে নেওয়ার জন্য গল্পচ্ছলে মাদরাসা, সংগঠন, বাড়ি, কলেজ বিভিন্ন বিষয়ে যোগাযোগ করেছিলাম, চেষ্টার ত্রুটি করিনি বলে আমার কাছে মনে হয়, সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি। কিন্তু তিনি বলেছিলেন, কাল সকালে আস অথবা কাল বিকেলে আস। যাও, আমি ফ্রি হলে তোমাকে কল দিয়ে ডেকে নিব ইত্যাদি।

হঠাৎ ভাইয়ের অসুস্থতা বেড়ে যাওয়ায় ঢাকা যেতে হল। ঢাকা যাওয়াই তাঁর জীবনের শেষ যাওয়া হবে তা কে জানত? তিনি ঢাকা থেকে ফিরেও আসলেন। তাঁকে দেখতে গেলাম। তিনি মারকাযের মেহমানখানায় শুয়ে আছেন নিথর, নিস্তব্ধ অবস্থায়। অথচ তিনি সুস্থাবস্থায় যখন মাদরাসায় আসতেন, তখন শিক্ষক, কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে মৃদু কম্পন বয়ে যেত। যেতেই হাতটা দেখি লেপের মধ্যে থেকে বের করার চেষ্টা করছেন, হাতটা বের করলেন আমার সাথে মুছাফাহা করলেন। কে জানে এটাই আমার সাথে দুনিয়া জীবনের শেষ বিদায়। বুকফাঁটা কান্না এসে গেল আমার। কেননা একদিন মারকাযের পূর্ব পার্শ্বস্থ বিল্ডিং-এর দ্বিতীয় তলায় সাক্ষাৎকার সুলভ মারকাযের ইতিহাস বলছিলেন। তিনি বলছিলেন, আমীরে জামা'আত যখন হড়গ্রাম ভাড়া বাসায় থাকতেন, একদিন তিনি আমাকে একটি যরূরী চিঠি দিয়ে নওদাপাড়ায় পাঠিয়েছিলেন। সাইকেলে চড়ে এখানে আসলাম। বিভিন্ন প্রয়োজনে তাঁর বাসায় যেতাম, স্যার আদেশ করতেন, জীবনে কত কষ্ট করেছি, মারকায তৈরীর এসব পেছনের ইতিহাস কেউ জানে না... তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। মারকাযের দোতলার ফ্লোরে কয়েক চক্কর দিলেন, ছোট মানুষের মত কাঁদতেই থাকলেন। আমি হতবাক বিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। তাকে থামানোর চেষ্টা করলাম, কিন্তু না, থামলেন না। যাও, পরে এস- বলে বিদায় দিলেন।

মারকাযের সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মাওলানা ফযলুল করীম উস্তাদজী হঠাৎ করে ভীষণ সংকটময় অবস্থায় পড়ে গিয়েছিলেন। অসুস্থতা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। মাদরাসার একজন যোগ্য সেক্রেটারী হিসাবে তিনি যে মানবিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা আমাদের সকলেরই জানা। যেখানে উস্তাদজীকে আমরা হারাতে বসেছিলাম, সেখানে এইভাবে তাঁকেই আমরা হারিয়ে ফেললাম। তাঁর সাক্ষাৎকারটা আমাদের নছীবে জুটলো না। তিনি মাদরাসা ও সংগঠনের জন্য যে সাহসী ভূমিকা রাখতেন, মেহনত করতেন, তা কোনদিনই ভোলার নয়। শেষ সাক্ষাতে গিয়ে শুনলাম, তিনি নাকি সুস্থ হয়ে উঠলে আরো জোরেশোরে দ্বীনের পথে সময় দিবেন এবং সংগঠনের কাজ করবেন বলে অঙ্গীকার করেছেন। এমন একজন মানুষ চলে যেতে পারে, ভাবতেই কষ্ট লাগে। তিনি আমাদের চির ঋণী করে চলে গেলেন। মহান আল্লাহ সবকিছুর বিনিময়ে তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস নছীব করুন-আমীন!

সংগঠন সংবাদ

প্রাগ্রসর কর্মী ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য প্রশিক্ষণ ২০২১

৯-১০ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার : অদ্য সকাল ৬:৩০টা থেকে ২দিন ব্যাপী প্রাগ্রসর কর্মী ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য প্রশিক্ষণ-২০২১ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকিরের অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ শুরু হয়। এরপর স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. মুখতারুল ইসলাম। এরপর উদ্বোধনী বক্তব্য ও প্রশিক্ষণ নির্দেশনা দেন কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। এরপর ২দিন ব্যাপী বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু ছিল- (১) ইখলাছ : আমল কবুলের প্রধান শর্ত/কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম, (২) তাকওয়া : ব্যক্তিত্ব গঠনের মূল উপাদান/কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর, (৩) সাংগঠনিক জীবনে আনুগত্য বা চেইন অফ কমাণ্ড অনুসরণের গুরুত্ব/ সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. কাবীরুল ইসলাম এবং 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মিনারুল ইসলাম, (৪) জিহাদ বনাম জঙ্গীবাদ : তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ/ কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য শরীফুল ইসলাম মাদানী, (৫) ইসলামে নেতৃত্ব নির্বাচন পদ্ধতি : ইক্বামতে দ্বীন বনাম ইসলামী খেলাফত/ কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. সাখাওয়াত হোসাইন এবং 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক আব্দুন নূর,

(৬) 'কর্মপদ্ধতি' অনুসরণের গুরুত্ব ও পদ্ধতি/কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর, (৭) মুসলিম সংহতি দৃঢ়করণ : পথ ও পদ্ধতি/কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. মুখতারুল ইসলাম (৮) ভারতীয় উপমহাদেশে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর গতিধারা ও সাংগঠনিক ইতিহাস/'যুবসংঘ'এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম, (৯) সংগঠনকে কিভাবে শক্তিশালী করব?/কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম এবং প্রশিক্ষণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ। বিশেষ অতিথির ভাষণ প্রদান করেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। উক্ত অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে হৃদয়গ্রাহী, মর্মস্পর্শী হেদায়াতী ভাষণ দেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। ২য় দিন শুক্রবার জুম'আর পূর্বে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের পর সমাপণী বক্তব্য ও মজলিস ভঙ্গের দো'আ পাঠের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কর্মশালার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব।

দেশব্যাপী উপযেলা কর্মী প্রশিক্ষণ ২০২১

২৩ ও ২৪শে ডিসেম্বর ২০২১ : অদ্য কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসাবে দেশব্যাপী উপযেলা কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

যশোর ২৪ই ডিসেম্বর ২০২১ শুক্রবার : অদ্য সকাল ১১টায় থেকে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, যশোর যেলার উদ্যোগে যেলা কার্যালয়ে কর্মী ও সূধী প্রশিক্ষণ-২০২১ এর আয়োজন করা হয়। যেলা সভাপতি হাফেয তরীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। উক্ত অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহীম। যশোর যেলার বিভিন্ন উপযেলা থেকে প্রায় ১২০ জন প্রতিনিধি এতে অংশগ্রহণ করেন।

বাঁকাল, সাতক্ষীরা ২৩ ও ২৪ই ডিসেম্বর ২০২১ শুক্রবার : বৃহস্পতিবার বাদ আছর থেকে বাঁকাল মাদ্রাসার ইসলামিক সেন্টারে সাতক্ষীরা যেলা 'যুবসংঘ'র উদ্যোগে কর্মী প্রশিক্ষণ-২০২১ অনুষ্ঠিত হয়। হাফেয মেজবাহ উদ্দিনের অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হওয়া প্রশিক্ষণে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন যেলা সভাপতি নাজমুল আহসান। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হুসাইন। উক্ত অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক শফিউল্লাহ।

মনিপুর বাযার, গাযীপুর ২৪ই ডিসেম্বর ২০২১, রোজ শুক্রবার : অদ্যবাদ সকাল ৯টা থেকে গাযীপুর যেলা যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে মনিপুর বাযার কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে প্রাগ্রসর কর্মী ও প্রথামিক সদস্য প্রশিক্ষণ-২০২১ এবং মাসিক তাবলীগ ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি শরিফুল ইসলামের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক, মাওলানা মুহাম্মাদ আবুল কালাম ও প্রধান অতিথি ছিলেন নিজাম উদ্দীন (মালিক, ট্রেকসিল মিটওয়াস লিমিটেড)। উক্ত অনুষ্ঠানে বুরহান উদ্দীনকে সভাপতি ও মোরশিদুল হককে সাধারণ সম্পাদক করে গাযীপুর মহানগর উপযেলা গঠন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানটি সঞ্চলনা করেন যেলা যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক সাইদুল হক।

বংশাল, ঢাকা ২৫ই ডিসেম্বর ২০২১ শনিবার : অদ্যবাদ এশা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে মালিটোলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ,

মোঘলটুলী, ঢাকায় মাসিক তাবলীগী ইজতেমার আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিতি ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আবুল কালাম।

মুহাম্মাদপুর, মাগুরা, ২৪শে ডিসেম্বর ২০২১ শুক্রবার : অদ্যবাদ যোহর মাগুরা যেলার মুহাম্মাদপুর উপযেলার নাগরায় এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। মশিউর রহমানের কুরআন তেলাওয়াতের মধ্যদিয়ে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মাগুরা যেলা সভাপতি ওহিদুল ইসলাম। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম। অনুষ্ঠান শেষে রাহাতুল ইসলামকে আহ্বায়ক ও আযীযুল ইসলামকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট মাগুরা যেলা 'যুবসংঘ' কমিটি গঠন করা হয়।

বিরামপুর, দিনাজপুর, ২৩শে ডিসেম্বর ২০২১ বৃহস্পতিবার : অদ্য ৯টা দিনাজপুর পূর্ব যেলা 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে দারুস সালাম মাদ্রাসা, বিরামপুরে দায়িত্বশীল ও কর্মী প্রশিক্ষণ-২০২১ অনুষ্ঠিত হয়। কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন যেলা সভাপতি রায়হানুল ইসলাম। উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুন নুর।

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)।*

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

দুস্থ ও ইয়াতীম প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী', নওদাপাড়া, রাজশাহী সহ দেশের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় চারশত দুস্থ ও ইয়াতীম (বালক/বালিকা) প্রতিপালিত হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ হ'তে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করে দুস্থ ও ইয়াতীম প্রতিপালনে নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন এবং অসহায়-অনাথ শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন!

স্তর সমূহের বিবরণ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	৩০০০/=	৩৬,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা

হিসাব নং : পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, হিসাব নম্বর ০১৫১২২০০০২৭৬১, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।

বিকাশ নং ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯, **ডাচ বাংলা :** ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯-৭।

বার্ষিক ৩৬,০০০/- টাকা দিয়ে ১ জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

দারুল হাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোন! আস্সালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু। নওদাপাড়া রাজশাহীতে অবস্থিত প্রস্তাবিত **দারুল হাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে** মসজিদটি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সাড়ে ছয় হাযার বর্গফুটের ছয়তলা বিশিষ্ট মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এতে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। এই খরচ নির্বাহের জন্য দানশীল মুমিন ভাই-বোনদের প্রতি সাহায্যের আবেদন জানানো যাচ্ছে। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর গৃহ নির্মাণে সাধ্যমত সহযোগিতা করার তাওফীক দান করুন-আমীন!!

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

ইসলামিক কমপ্লেক্স মসজিদ ফাণ্ড, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৫৮২, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক রাজশাহী শাখা। সার্বিক যোগাযোগ : ০১৭১৫-০০২৩৮০, ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।

সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)

১. **প্রশ্ন :** মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দাওয়াতী কাজে কারা বিরোধীতা করতেন?
উত্তর : কুরায়েশ নেতারা।

২. **প্রশ্ন :** মক্কার পথে পথে হাজীদের নিকট কোন অপবাদ প্রচার করার জন্য লোক নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল?
উত্তর : 'জাদুকর'।

৩. **প্রশ্ন :** সে সময়ে মক্কার অন্যতম ধনী ব্যক্তি কে ছিলেন?
উত্তর : অলীদ বিন মুগীরা আল-মাখযুমী।

৪. **প্রশ্ন :** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট কুরআনের আয়াত শুনে কোন কাফেরের অন্তর গলে যায়?
উত্তর : আবু জাহলের।

৫. **প্রশ্ন :** অলীদ বিন মুগীরাহ হিজরতের কত মাস পর মৃত্যুবরণ করেন?
উত্তর : তিন মাস পর।

৬. **প্রশ্ন :** অলীদ বিন মুগীরাহকে কোথায় সমাহিত করা হন?
উত্তর : হাজূনে।

৭. **প্রশ্ন :** হজ্জের আগে হারাম মাস কয়টি?
উত্তর : দু'টি।

৮. **প্রশ্ন :** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হজ্জে আগত মেহমানদের কোথায় দ্বীনের দাওয়াত দিতেন?
উত্তর : তাদের তাঁবুতে।

৯. **প্রশ্ন :** রাসূলকে কোন বাজারে পাথর ছুঁড়ে মেরেছিল?
উত্তর : যুল-মাজায।

১০. **প্রশ্ন :** অপপ্রচারের ফলে রাসূল (ছাঃ)-এর দাওয়াত কাদের কাছে গিয়ে পৌঁছালো?
উত্তর : সুদূর ইয়াছরিবের কিতাবধারীদের নিকট।

১১. **প্রশ্ন :** রাসূল (ছাঃ) খাদ্য ও হাট-বাজারে যেতেন, কুরআনের কোন আয়াতে বর্ণিত হয়েছে?
উত্তর : ফুরক্বান ২৫/৭।

১২. **প্রশ্ন :** ধর্মত্যাগী বলে রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে কে অপপ্রচার চালাত?
উত্তর : আবু লাহাব।

১৩. **প্রশ্ন :** 'মুহাম্মাদ' শব্দের অর্থ কী?
উত্তর : প্রশংসিত।

১৪. **প্রশ্ন :** 'মুযাম্মাম' শব্দের অর্থ কী?
উত্তর : নিন্দিত।

১৫. **প্রশ্ন :** 'মুযাম্মাম' শব্দ নিয়ে ব্যঙ্গ করে কে কবিতা লিখেছিল?
উত্তর : আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল।

১৬. **প্রশ্ন :** কুরায়েশ নেতা ও বিত্তশালী ব্যবসায়ী নযর বিন হারেছ কোথায় চলে যায়?
উত্তর : ইরাকের 'হীরা' নগরীতে।

১৭. **প্রশ্ন :** আছহাবে কাহফের সেই যুবকরা কত বছর ঘুমিয়েছিল?
উত্তর : ৩০৯ বছর।

১৮. **প্রশ্ন :** রাসূলের শানে 'রূহ' সম্পর্কিত অবতীর্ণ আয়াত কোনটি?
উত্তর : সূরা বনু ইস্রাইল ৮৫ আয়াত।

১৯. **প্রশ্ন :** তওরাতের ভাষা কী?
উত্তর : 'হিব্রু'।

২০. **প্রশ্ন :** চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার সময় কোন কোন ছাহাবী উপস্থিত ছিলেন?
উত্তর : হযরত আলী, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ প্রমুখ।

২১. **প্রশ্ন :** হযরত মুসা (আঃ)-এর অন্যতম মু'জেযা কি?
উত্তর : লাঠির সাহায্যে নদী বিভক্তকরণ।

২২. **প্রশ্ন :** চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে কোন দিকে ছিটকে পড়লো?
উত্তর : পূর্ব ও পশ্চিমে।

২৩. **প্রশ্ন :** রাসূল (ছাঃ) কতৃক দ্বিখণ্ডিত চাঁদ কোন পর্বতের ফাঁক দিকে দেখা যাচ্ছিল?
উত্তর : 'হেরা' পর্বত।

২৪. **প্রশ্ন :** রাসূল (ছাঃ)-এর চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার সময় কোথায় ছিলেন?
উত্তর : মিনা-তে।

২৫. **প্রশ্ন :** আপোষমুখী প্রস্তাব নিয়ে রাসূল (ছাঃ) এর কাছে কে আসেন?
উত্তর : আসওয়াদ বিন আবদুল মুত্ত্বালিব, অলীদ বিন মুগরিাহ, উমাইয়া বিন খালাফ, প্রমুখ।

২৬. **প্রশ্ন :** ১৯৬৯ সালের ২০শে জুলাই চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার কাহিনীকে কেন্দ্র করে কোন বিজ্ঞানী ইসলাম গ্রহণ করেন?
উত্তর : নীল আর্মষ্ট্রং।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বাংলাদেশ)

১. **প্রশ্ন :** বাংলাদেশের কোন মাদরাসায় মিসরের বিখ্যাত আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা চালু হতে যাচ্ছে?
উত্তর : রাজশাহী দারুস সালাম কামিল মাদরাসা।

২. **প্রশ্ন :** ১৫ নভেম্বর ২০২১ রাশিয়া ক্ষেপণাস্ত্র চালিয়ে নিজেদের কোন স্যাটেলাইট ধ্বংস করে?
উত্তর : kosmos-1408 ।

৩. **প্রশ্ন :** প্রবাসী আয়ে বাংলাদেশের অবস্থান কত?
উত্তর : সপ্তম।

৪. **প্রশ্ন :** দেশে নির্মিতব্য নতুন দু'টি ভূমি জরিপ প্রতিষ্ঠানের নাম কী?
উত্তর : পটুয়াখালী ল্যান্ড সার্ভে ইনস্টিটিউট ও যশোর ল্যান্ড সার্ভে ইনস্টিটিউট।

৫. **প্রশ্ন :** বর্তমান দেশের চালুকৃত ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা কতটি?
উত্তর : ৪৫৬টি। চলমান প্রকল্পের কাজ শেষ হলে ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা হবে ৫৬৫টি।

৬. **প্রশ্ন :** প্রবাসী আয়ের পূর্বাভাসের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশ কত তম?
উত্তর : ২৩তম।

৭. **প্রশ্ন :** প্রবাসী আয়ের পূর্বাভাসের হিসাব অনুযায়ী ভারত কত তম?
উত্তর : ৮৭তম।

৮. **প্রশ্ন :** বিশ্বের গভীরতম পাইলের সেতু কত মিটার?
উত্তর : ১২২ মিটার।

৯. **প্রশ্ন :** বিশ্বের গভীরতম পাইলের সেতুর নাম কি?
উত্তর : পদ্মা।

১০. **প্রশ্ন :** ভার্টিক্যাল আরসিসি পাইলে প্রাউটিং ইনজেক্ট স্টিল ফ্রিকশনে নির্মিত একমাত্র সেতুর নাম কি?
উত্তর : পদ্মা।

১১. **প্রশ্ন :** বিশ্বের দীর্ঘতম ট্রাস সেতুর নাম কি?
উত্তর : পদ্মা।

১২. **প্রশ্ন :** ২০২০-২১ অর্থবছরে খাদ্যশস্য উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে কত?
উত্তর : ৪৬৬.৩৫ লাখ মেট্রিক টন।

ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) মোবাইল এ্যাপ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে ছালাত শিক্ষার নির্ভরযোগ্য ও বিস্তারিত দলীল সমৃদ্ধ জনপ্রিয় গ্রন্থ প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব রচিত ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)। মাননীয় লেখক বইটিতে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে ছালাতের প্রত্যেকটি বিধান তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। সংক্ষিপ্ত পরিসরে খুঁটিনাটি মাসআলা সমূহের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন।

এ্যাপটিতে উক্ত গ্রন্থের বাংলা ও ইংরেজী ভার্সন যুক্ত করা হয়েছে এবং নানা সুবিধা যুক্ত করে সহজে ব্যবহারযোগ্য করে তোলা হয়েছে।

আইটি বিভাগ, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১। মোবাইল : ০১৭২০-০৫৯৪৪২

এ্যাপটি পেতে স্ক্যান করুন

ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)
Salatur Rasool
GET ON Google Play

আপনার সোনামণির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে আজই সংগ্রহ করুন

সোনামণি প্রতিভা

(একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর'১২ হ'তে দ্বি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন **'সোনামণি'**-এর মুখপত্র **'সোনামণি প্রতিভা'**।

লেখা আহ্বান

মেধাবী সোনামণি, দায়িত্বশীল এবং নবীন লেখকদের নিকট থেকে **'সোনামণি প্রতিভা'**র জন্য উক্ত বিভাগ সমূহে সোনামণিদের পাঠ উপযোগী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। সাথে সাথে সোনামণিদেরকে কলমী জিহাদে উৎসাহিত ও সার্বিক সহযোগিতা করতে অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

নিয়মিত বিভাগ সমূহ :

বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ, হাদীছের গল্প এসো দো'আ শিখি, ইতিহাস, রহস্যময় পৃথিবী, যেলা ও দেশ পরিচিতি, যাদু নয় বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ম্যাজিক ওয়ার্ড, গল্পে জাগে প্রতিভা, একটু খানি হাসি, অজানা কথা, বহুমুখী জ্ঞানের আসর, কবিতা, মতামত ইত্যাদি।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা) নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩, ০১৭২৬-৩২৫০২৯, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭।

সদ্য প্রকাশিত ও পরিমার্জিত কিছু বই

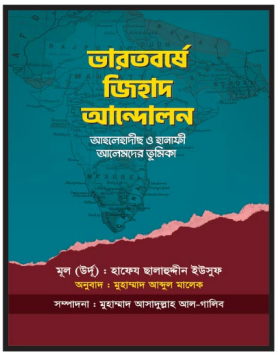

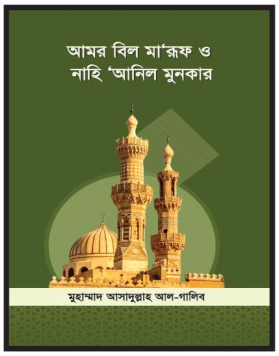

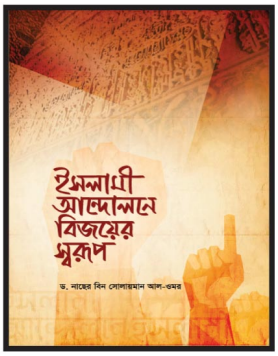

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী, মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০; ঢাকা অফিস : ২২০ বংশাল, মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১

দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় ও তাবলীগী ইজতেমা ময়দানের জমি ক্রয় প্রকল্পে সহযোগিতা করুন!

সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোনেরা!

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে পরিচালিত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর বার্ষিক 'তাবলীগী ইজতেমা' ১৯৯১ সাল থেকে বিগত ৩১ বছর যাবৎ রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়ায় অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ইজতেমায় পূর্ব নির্ধারিত বিষয় সমূহের উপর দলীল ভিত্তিক ও আখেরাতমুখী আলোচনা শ্রোতাদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। প্রতি বছর লক্ষাধিক মানুষ এখানে জমায়েত হন। আল্লাহ্র অশেষ রহমতে এর মাধ্যমে হাযার হাযার মানুষ বিশুদ্ধ দ্বীনের পথে ফিরে আসছেন। প্রতিবছর উপস্থিতির হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে কয়েক বছর যাবৎ জায়গার সংকটের কারণে উপস্থিত ভাই-বোনদের দারুণ কষ্ট সহ্য করতে হয়। একই কারণে মহিলাদের অংশগ্রহণের সুযোগ বর্তমানে পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় ২০২১ সালের তাবলীগী ইজতেমায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** আগামীতে নিজস্ব ময়দানে তাবলীগী ইজতেমা করার জন্য ৫০ থেকে ১০০ একর জমি ক্রয়ের ঘোষণা দেন এবং উক্ত স্থানে বিশুদ্ধ দ্বীন শিক্ষার সর্বোচ্চ কেন্দ্র হিসাবে প্রস্তাবিত 'দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয়'-এর বৃহত্তর ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। একইসাথে সেখানে উচ্চতর গবেষণা কেন্দ্র, শিক্ষক ও ইমাম প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে উক্ত প্রকল্পের স্থান নির্ধারিত হয়েছে এবং এক একর জমি ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে। সাথে সাথে পার্শ্ববর্তী জমিসমূহ ক্রয়ের প্রক্রিয়া চলছে। *ফালিল্লাহিল হামদ*।

অতএব দানশীল ভাই-বোনদেরকে উক্ত বিশাল প্রকল্প বাস্তবায়নে উদার হস্তে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি এবং সামর্থ্য অনুযায়ী এক বিঘা বা এক কাঠা জমির মূল্য অথবা কমপক্ষে একজন বসার স্থানের সমপরিমাণ মূল্য ২৫০০ টাকা এবং সংগঠনের সদস্যদের প্রত্যেককে ৫ থেকে ১০ হাযার টাকা দান করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। যিনি যত বেশী দান করবেন তার নেকীর পাল্লা তত বেশী ভারী হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আমাদেরকে উক্ত ছাদাক্বায়ে জারিয়ায় অংশগ্রহণ করার তাওফীক দান করুন- আমীন!

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা

তাবলীগী ইজতেমা ফাণ্ড, **একাউন্ট নং ০০৭১২২০০০০৭১৭**
আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক রাজশাহী শাখা।
বিকাশ ও নগদ নং ০১৭৯৭-৯০০১২৩; রকেট নং ০১৭৯৭-৯০০১২৩০

সেক্রেটারী জেনারেল
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

সার্বিক যোগাযোগ : কেন্দ্রীয় কার্যালয়, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৬০৫২৫, মোবাইল : ০১৭৯৭-৯০০১২৩, ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।